স্বামীর হক স্ত্রীর অধিকার

আল্লামা তকী উসমানী



নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

স্বামীর হক স্ত্রীর অধিকার

মূল

বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী

ভাইস প্রেসিডেন্ট, আন্তর্জাতিক ফিকাহ্ একাডেমী, সৌদী আরব

জাস্টিস, শর'য়ী আদালত, সুপ্রিম কোর্ট, পাকিস্তান

সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ (উর্দু-ইংরেজি)

রূপান্তর

হাফেজ মাওলানা শাববীর আহমাদ শিবলী

সভাপতি, আবাবীল সংসদ, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ

সাথী, ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন

৫৯, চকবাজার - ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

স্বামীর হক স্ত্রীর অধিকার

বিচারপতি আল্লামা তকী উসমানী

প্রকাশক

মাওলানা মাছউদুল হাছান

নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন

নাদিয়া ভবন ৫৯, চকবাজার
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন ঃ ৭৩১০১৫৩

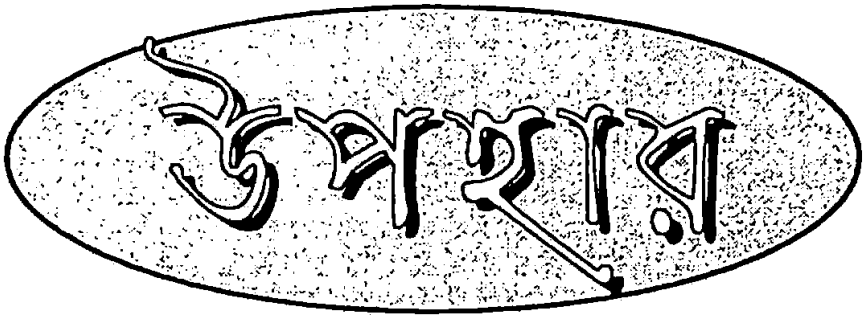
প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০১ ইং

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

মূল্য : ১১০.০০ টাকা মাত্র

SHAMIR HOQ STREER ADHIKAR. JUSTICE ALLAMA TOKI OSMANI. TRANSLATED BY HAFEZ MAULANA SHABBIR AHMAD SHIBLI.
PUBLISHED BY NADIATUL QURAN FOUNDATION.
59. CHAK BAZAR 50. BANGLA BAZAR DHAKA. BANGLADESH.
PRICE : TK. 56 ONLY



‘স্বামীর হক স্ত্রীর অধিকার’ বইখানা

আমার.....

.....কে

স্নেহের/শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

উপহার

দিলাম

উপহারদাতা.....

তারিখ ঃ.....

তুহ্‌ফা

যাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে
পাঠিয়েছেন, সেই মহান ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় আব্বাজান
আলহাজ হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (রাহঃ)
প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়াতুল কুরআন (কুরআন শিক্ষাবোর্ড)-এর রূহের
মাগফিরাত কামনায়

ও

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজন, যাঁর স্নেহ-সুধা ও সক্রিয়
নির্দেশনা আমাদের আগামী দিনগুলির উজ্জলতর ভবিষ্যত
নির্মাণে সহায়ক হবে। তাঁর পূন্য-ভরা হাতে
আমাদের এই সামান্য তুহফাটুকু...

- প্রকাশক

অনুবাদকের আরয

মহান আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব জাতির দু'টি সত্তা হচ্ছে নর এবং নারী। নর এবং নারী এরা অপরের জন্য অপরিহার্য এবং সম্পূরক। তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা (নারীরা) তোমাদের (পুরুষদের) জন্য পরিচ্ছদ স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের জন্য পরিচ্ছদ স্বরূপ'।

প্রকৃতিগতভাবেই মহান আল্লাহ নারীকে পুরুষের জন্য স্বস্তিময় সাথী বানিয়েছেন। বাবা আদমকে সৃষ্টি করার পর তিনি জান্নাতে বসবাস করছিলেন। সেখানে শান্তি-সুখের কোন উপায়-উপকরণের কমতি ছিল না। ছিল সবুজ-শ্যামল পরিবেশ, পাখ-পাখালীর কলতান, ঝরণার সুমধুর কলকল ধ্বনি। ছিল আল্লাহর নেয়ামতের অফুরন্ত ভান্ডা র। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বাবা আদম কেন যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর মন আনচান করছিল। কিসের যেন বড় অভাব অনুভব করছিলেন তিনি। এরই মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মা হাওয়াকে সৃজন করে তাঁর পাশে রেখে দিলেন। এবার বাবা আদমের সকল অস্বস্তির অবসান ঘটল।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বাবা আদম এবং মা হাওয়াকে এ ধরাধামে পাঠালেন তাঁর সৃষ্টিরহস্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য। কিন্তু প্রকৃতির সেই অমোঘ আকর্ষণ আজো পুরুষের মাঝে লক্ষ্যনীয়। এখানে একটি নারী আর একটি পুরুষ কতিপয় সুশৃংখল নীতি-বিধানের মধ্য দিয়ে সংযোগ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। যার নাম 'বিয়ে'। বিয়ে নামক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা রচনা করে একটি 'দাম্পত্য জীবন'।

নারী পুরুষের এই দাম্পত্য জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করে তোলার জন্য ইসলাম উভয়ের উপর কতিপয় দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছে। যে সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এই দাম্পত্য জীবনেই তারা জান্নাতী সুখ লাভ করতে পারে। আবার সে সকল দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করলে

দাম্পত্য জীবনে নেমে আসতে পারে সীমাহীন অশান্তি ফলে পরিবার পরিণত হতে পারে জাহান্নামের একটি অগ্নিকুন্ডে।

বক্ষমান পুস্তকটি আল্লামা তাকী উসমানী সাহেবের দু'টি বয়ান। বয়ান দু'টিতে তিনি স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপর উভয়ের যে সকল অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি আমাদের পারিবারিক জীবনের এমন অনেক অজানা বিষয়ও তার মূল্যবান আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে, যে সকল বিষয় নিয়ে পরিবারের পর পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। তাঁর আলোচনায় আরো উপস্থাপিত হয়েছে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার অসারতা। পুস্তকটির নামকরণে 'স্বামীর হক' পূর্বে উল্লেখ হলেও পুস্তকটি শুরু করা হয়েছে 'স্ত্রীর অধিকারে'র মধ্য দিয়ে। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পাঠকদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এটি কোন স্বতন্ত্র রচনা নয়, বরং ক্যাসেটে ধারণকৃত দু'টি উর্দু বয়ানের সরল অনুবাদ। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বয়ানের অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে একই বাক্য বা একই প্রসঙ্গ একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে।

পুস্তকটি প্রকাশিত হচ্ছে নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন থেকে। মাওলানা মাছউদুল হাসান সাহেবের আন্তরিক উদ্যোগেই মুলত: 'স্বামীর হক স্ত্রীর অধিকার' সূর্যের মুখ দেখতে সক্ষম হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা একে ওসীলা করে এর লেখক প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলের মুক্তির ফায়সালা করে দিন। আমীন।

বিনীত

শাববীর আহমাদ শিবলী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীর অধিকার	
হুকূকুল ইবাদের গুরুত্ব	১০
বান্দার হকের ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা	১১
গীবত বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত	১১
সর্বদাই 'এহসান' কাম্য	১২
সে মহিলা জাহান্নামে যাবে	১৩
জান্নাতী মহিলা	১৪
প্রকৃত দরিদ্র কে?	১৪
হুকূকুল ইবাদ দ্বীনের তিন অংশ	১৪
ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থান	১৫
নারীর সাথে সদাচরণে ইসলাম	১৫
পবিত্র কুরআন শুধু মূলনীতি বর্ণনাকারী	১৭
পারিবারিক জীবন পূরা সমাজ-সভ্যতার ভিত্তি	১৭
পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা নারীর সৃষ্টিরহস্য	১৮
এটা নারীর জন্য দোষনীয় নয়	১৯
বক্রতাই নারীর প্রকৃতি	১৯
'উদাসীনতা' নারীর শোভা	১৯
জোরপূর্বক সোজা করার প্রয়াস চালিয়ো না	২০
ঝগড়ার মূল কারণ	২১
তার কোন স্বভাব পছন্দনীয়ও হবে	২১
ভাল-মন্দ মিলেই সকল কিছুর সৃষ্টি	২২
একটি ইংরেজী প্রবাদ	২২
ভালাই সন্ধান করলে তা পাবেই	২৩
কুদরতের কারখানায় কোন মন্দ নেই	২৩
নারী জাতির ভাল গুনাগুনের দিকে দৃষ্টি দাও	২৩
জনৈক বুযুর্গের শিক্ষনীয় ঘটনা	২৪
হযরত মির্যা মাযহার জানেজানা (রাহঃ) এবং নাযুক মেযাজ	২৪
আমাদের সমাজের নারীরা এ জগতের হুর	২৫
স্ত্রীকে প্রহার করা গর্হিত আচরণ	২৫
স্ত্রীর সংশোধনের ৩টি স্তর	২৬
স্ত্রীকে প্রহার করার সীমা	২৭
স্ত্রীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদ্ব্যবহার	২৭
রাসূলের সুন্নত	২৭
হযরত ডাক্তার সাহেবের কারামত	২৮
খেদমত বিহীন তরীকত লাভ আদৌ সম্ভব নয়	২৮
শুধু দাবী যথেষ্ট নয়	২৯
বিদায় হজ্জের ভাষণ	৩০
নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব	৩১
স্ত্রীরা তোমাদের নিকট কয়েদিসম	৩১
এক অবলা নারী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো	৩২
স্ত্রীরা তোমাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে	৩২
তোমাদের আর কোন দাবী নেই	৩৩
খানা প্রস্তুত করা স্ত্রীদের দায়িত্ব নয়	৩৩
শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত ওয়াজিব নয়	৩৪
শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত সৌভাগ্যের বিষয়	৩৪
পুত্রবধুর খেদমতের মূল্যায়ন করতে হবে	৩৫
একটি আজব ঘটনা	৩৫
এরূপ ব্যক্তি প্রশংসা করতে পারে না	৩৬
স্বামী তার মাতা-পিতার খেদমত স্বয়ং করবে	৩৬
নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাওয়া বৈধ নয়	৩৭
উভয়ে মিলে জীবনতরী চালিয়ে নিবে	৩৭
যদি নারী নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়	৩৮
স্ত্রীদের পকেট খরচা আদালা প্রদান করবে	৩৮
খরচা প্রদানের ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দেয়া চাই	৩৯
বাসস্থান এবং আরাম-আয়েশ বৈধ	৩৯
শোভা-সৌন্দর্য অবৈধ নয়	৪০
প্রদর্শনী জায়েয নয়	৪০
অপব্যয়ের সীমা	৪০
এটা অপব্যয় নয়	৪১
প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা ভিন্ন ভিন্ন	৪১
এ মহলে আল্লাহর সন্ধানকারী নির্বোধ	৪২
এ অবস্থা অনুকরণযোগ্য নয়	৪৩
আয় অনুপাতে ব্যায়	৪৩
আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি?	৪৪
তাদের বিছানা পৃথক করে দাও	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
এরূপ পৃথকতা জায়েয নয়	৪৪
চার মাসের অধিক সফরে বের হলে স্ত্রীর অনুমতি	৪৫
শ্রেষ্ঠ মানুষ কে?	৪৫
আজকের যুগের উত্তম আচরণ	৪৬
'হুসনে আখলাক' বা সদ্ব্যবহার এটা অন্তরের একটি অবস্থার নাম	৪৭
'উত্তম আখলাক' সৃষ্টির উপায়	৪৭
আল্লাহর বান্দীদের মেরো না	৪৭
হাদীসে যন্নী কিংবা কত'য়ী	৪৮
সাহাবায়ে কেরামই এর উপযুক্ত ছিলেন	৪৮
নারীরা বাঘে পরিণত হল	৪৯
এরা ভাল মানুষ নয়	৫০
পৃথিবীর সর্বোত্তম বস্তু 'পুণ্যবান নারী'	৫১
মন্দ নারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে	৫২

স্বামীর হক

সকলেই স্বীয় হক আদায়ে ব্যস্ত	৫৪
প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব যথাযথ আদায় করবে	৫৫
প্রথম নিজকে নিয়ে ভাবতে হবে	৫৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার সারকথা	৫৬
জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দময় করার উপায়	৫৭
ইবলীসের দরবার	৫৮
পুরুষ নারী উপর কতৃত্বশীল	৫৯
বর্তমান দুনিয়ার প্রোপাগান্ডা	৬০
ভ্রমণ অবস্থায় একজনকে নেতা বানাবে	৬০
জীবন চলার পথে কে হবে নেতা	৬০
ইসলামে আমীর বা নেতার অবস্থান	৬১
নেতা হলে এরূপ হও	৬২
নেতা হবে সেই সেবা জানে যে	৬৩
স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বের	৬৩
এরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি কাম্য নয়	৬৪
রাসূলের সুন্নত দেখুন!	৬৪
স্ত্রীর মান-অভিমানও সহ্য করতে হবে	৬৫
স্ত্রীর মনোতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা সুন্নত	৬৭
স্ত্রীর সাথে হাস্য-রসিকতা করাও সুন্নত	৬৭
নতুবা সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে	৬৮
নারীর দায়িত্বসমূহ	৬৯
রসহীন বিধি-বিধানের গন্ডিতে জীবন চলতে পারে না	৬৯
স্ত্রীদের অন্তরে স্বামীর সম্পদের দরদ থাকা আবশ্যক	৭০
এরূপ নারীর উপর ফেরেশতাদের অভিসম্পাত	৭০
স্বামীর অনুমতি ও নফল রোযা	৭১
স্বামীর আনুগত্য বনাম নফল ইবাদত	৭২
গৃহস্থালী কাজকর্মে সওয়াব	৭২
যৌন চাহিদা পূরণের মাঝেও পুণ্য	৭৩
আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি	৭৩
কাযা রোযার ক্ষেত্রে স্বামীর ছাড় দেওয়া উচিত	৭৪
ঘরে অন্যের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি	৭৪
হযরত উম্মে হাবীবার ইসলাম গ্রহণ	৭৫
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে	৭৭
একাধিক বিয়ের কারণ	৭৮
অমুসলিমের মুখে রাসূলের প্রশংসা	৭৮
চুক্তি ভঙ্গ	৭৮
আপনি এই বিছানার উপযুক্ত নন	৭৯
স্ত্রী তৎক্ষণাত সাড়া দেবে	৮০
বিয়ে জৈবিক স্বস্তি অর্জনের বৈধ উপায়	৮০
বিয়ের সহজবোধ্যতা	৮০
বরকতময় বিয়ে	৮১
হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের বিয়ে	৮১
আজকে বিয়েকে জটিল করে ফেলা হয়েছে	৮২
যৌতুক এক সামাজিক অভিশাপ	৮৩
স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম	৮৪
দু'টি মনের বন্ধন	৮৫
সবচেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র	৮৫
নতুন সমাজের সকল কিছুতেই উল্টা স্রোত	৮৬
নারীর দায়িত্ব	৮৭
সে নারী সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে.	৮৭
সে তোমাদের নিকট কয়েক দিনের মেহমান	৮৮
পুরুষদের জন্য কঠিন পরীক্ষা	৮৮
নারী পুরুষের জন্য কিভাবে ফেতনা	৮৯
প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল	৯০
নেতা তার অধিনস্তদের রক্ষক	৯১
খেলাফত একটি বিরাট বোঝা	৯১
পুরুষ স্ত্রী এবং সন্তানের রক্ষক	৯২
স্ত্রী স্বামীর ঘর এবং সন্তানদের যিম্মাদার	৯৩
স্ত্রী জাতি হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করবে	৯৩
স্ত্রীদের জন্য এক দুর্লভ ব্যবস্থাপত্র 'তাসবীহে ফাতেমী'	৯৫
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা মায়ের দায়িত্ব	৯৫

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

স্ত্রীর অধিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْ..... اَمَّابَعْدُ .فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (سورة النساء :١٩)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع وَاِنْ اَعْوَجَ مَافِى الضِّلع اعلاه فَاِن ذَهَبت تقيمه كسرتَهٗ وَاِنْ تَرَكْتَه لَمْ يزل اعوج فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ

(صحيح بخارى كتاب النكاح باب المدارة مع النساء حديث نمبر ٥١٨٤)

হুকূকুল ইবাদের গুরুত্ব

আমার পঠিতব্য আয়াত এবং হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকে হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ এবং তদীয় নবী-রাসূলগণ বান্দার যে সকল হক আদায় ও সংরক্ষণের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সে সকল হক সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছি।

আমি এর পূর্বেও বার বার বলেছি যে, 'হুকূকুল ইবাদ' বা বান্দার হক সংরক্ষণ এটা দ্বীনের একটি অত্যন্ত বড় অধ্যায় এবং এতই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যে, 'হুকূকুল্লাহ' বা আল্লাহর হকতো তওবার দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায়। অর্থাৎ খোদা না করুন কখনো ভুল-চুকে আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত

কোন গোনাহ্-খাতা হয়ে গেলে তার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথ অত্যন্ত সহজ; আর তা হচ্ছে-স্বীয় কৃতকর্মের উপর অনুশোচিত ও লজ্জিত হয়ে এস্তেগফার করে নিলে ক্ষমা পেয়ে যাবে। কিন্তু বান্দার হক এরূপ যে, যদি কখনো কারো হক নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে শুধু অনুশোচিত ও লজ্জিত হয়ে তাওবা-এস্তেগফার করলেই ক্ষমা হবে না, যতক্ষণ না হকদারের হক আদায় করা না হবে কিংবা তার থেকে ক্ষমা না চাওয়া হবে। অতএব বান্দার হকের বিষয়টি খুবই জটিল।

বান্দার হকের ক্ষেত্রে আমাদের উদাসীনতা

বান্দার হকের ব্যাপারটি যে পরিমাণ জটিল, তার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতাও তদ্রুপ। আমরা কতিপয় ইবাদতের মাঝে দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির, তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদিকে আমরা ঠিকই দ্বীন মনে করি, কিন্তু হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক সংরক্ষণকে আমরা দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছি। এমনিভাবে সামাজিক অধিকারও আমরা দ্বীনবহির্ভূত কোন বিষয় বলে মনে করি। এ সকল অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেউ অলসতা বা ত্রুটি করলে আমরা সেটাকে কোন দোষ বলেই মনে করি না।

গীবত বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত

এর সোজা উদাহরণ হচ্ছে-আল্লাহ না করুন কোন ব্যক্তি মদ্যপানের অপরাধে লিপ্ত। তাহলে দ্বীনের সাথে ন্যুনতম সম্পর্কশীল কোন মুসলমান এটাকে অন্যায় বলে মনে করে। উপরন্তু মদ পানকারী স্বয়ং নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে ভাবে-আমি একটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করছি। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি মানুষের গীবত বা দোষচর্চা করছে। অথচ গীবতকারীকে সমাজের বুকে মদপানকারীর ন্যায় অপরাধী মনে করা হচ্ছে না এবং স্বয়ং গীবতকারীও নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে না। অথচ গোনাহের ক্ষেত্রে মদ্যপান যেরূপ একটি বড় গোনাহ, গীবত করাও তদ্রুপ বড় গোনাহ। বরং গীবতের গোনাহ আরো অধিক মারাত্মক। কারণ এর সম্পর্ক হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকেও গীবতের গোনাহ অত্যন্ত মারাত্মক যে, পবিত্র কুরআনে গীবতের কদর্যতা সম্পর্কে

এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে, অন্য কোন গোনাহের ক্ষেত্রে যা করা হয়নি। সুতরাং পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-গীবতকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে মৃত ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করে। কিন্তু এটি এত মারাত্মক গোনাহ হওয়া সত্ত্বেও সমাজের বুকে এটি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আলোচনার কোন মজলিসই এই গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। এটাকে কোন অপরাধই মনে করা হয় না। যেন দ্বীনের মঙ্গল-অমঙ্গলের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

সর্বদাই 'এহসান' কাম্য

আমার শায়খ ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব (কুঃ সিঃ) আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। এক দিন তিনি বলতে লাগলেন-এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে অত্যন্ত গর্বভরে আনন্দের সাথে বলতে লাগল, আল্লাহর সীমাহীন কৃতজ্ঞতা যে, আমার 'এহসান' এর মর্তবা অর্জিত হয়ে গেছে। 'এহসান' এক অনেক বড় মর্তবাকর স্থান। যার ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ

(ছহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, জিবরাঈলের প্রশ্ন অধ্যায়-হাদীস নং ৫০)

অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এভাবে সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত: এই মন-মানস নিয়ে এবাদত করবে যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখছেন। একেই বলে 'এহসান'। সুতরাং সে ব্যক্তি হযরতকে বলল, আমার 'এহসান'-এর মর্যাদা অর্জিত হয়ে গেছে।

হযরত ডাক্তার সাহেব (রাহঃ) বলেন, আমি তাকে মোবারকবাদ দিলাম এই বলে যে, আল্লাহ তাআলা আপনার মঙ্গল করুন। এটাতো অনেক উঁচু মর্তবা এবং অনেক বড় নেয়ামত। তবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি, তা হচ্ছে-আপনার এই 'এহসান'-এর দর্জা কি শুধু নামাযের ক্ষেত্রেই অর্জিত হয়? নাকি আপনার বিবি-বাচ্চার সাথে লেদ-দেন ও উঠা-বসা করার ক্ষেত্রেও অর্জিত হয়? অর্থাৎ যখন আপনি বিবি-বাচ্চাদের সাথে উঠা-বসা করেন, তখনও কি আপনার এ কথা খেয়ালে আসে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখছেন। নাকি এই খেয়াল তখন আসে না। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, হাদীস শরীফেতো এসেছে-যখন তুমি নামায পড়বে এভাবে নামায

পড়বে যে, তুমি আল্লাহকে দেখছো। নতুবা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। সুতরাং আমিতো মনে করেছি 'এহসান' এটা শুধু ইবাদতের সাথেই সম্পৃক্ত। শুধু নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত। অন্য সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

হযরত ডাক্তার সাহেব (রাহঃ) বললেন, আমিতো এ জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি। কারণ আজকাল মানুষ ব্যাপকভাবে এই ভুলের মাঝে নিপতিত যে, 'এহসান' শুধু নামাযের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিংবা যিকির তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথচ 'এহসান' সকল কাজে সর্বদা কাম্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল ধাপে কাম্য। দোকানে বসে ব্যবসা করছো, সেখানেও 'এহসান' কাম্য। অর্থাৎ এ কথা মনে জাগরুক রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রত্যক্ষ করছেন। অধিনস্তদের সাথে লেন-দেন করা হচ্ছে, সেখানেও 'এহসান' কাম্য। নিজের স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে লেন-দেন করছো, তখনো এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন। সুতরাং সারকথা হচ্ছে এহসানের হাকীকত শুধু নামায-রোযা প্রভৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

সে মহিলা জাহান্নামে যাবে

খুব ভাল করে স্মরণ রাখুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বর্ণনায় এসেছে, জনৈক মহিলা সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল-হে আল্লাহর রাসূল! একজন মহিলা দিবারাত ইবাদতে মশগুল। নফল নামায, যিকির-তেলাওয়াত অনেক বেশী করে এবং সর্বদা এসবের মাঝেই লিপ্ত থাকে। এই মহিলার ব্যাপারে আপনার খেয়াল কি? তার শেষ পরিণতি কিরূপ হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিবেশীর সাথে সে কিরূপ আচরণ করে?

সাহাবাগণ আরয করলেন, প্রতিবেশীর সাথে তার আচরণ ভাল নয়। প্রতিবেশীরা তার উপর সন্তুষ্ট নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহিলা জাহান্নামে যাবে। (বুখারী)

জান্নাতী মহিলা

অত:পর এমন একজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে নফল ইবাদত খুব বেশী করে না। শুধু ফরজ-ওয়াজিবসমূহ আদায় করে থাকে। আর বেশীর চেয়ে বেশী সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করে। এর চেয়ে অধিক নফল এবাদত, যিকির-তেলাওয়াত সে করে না। কিন্তু প্রতিবেশী সহ অপরাপর মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুব ভাল। সকলেই তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে মহিলা জান্নাতী।

প্রকৃত দরিদ্র কে?

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, যদি কেউ নফল ইবাদত করে, তাহলে তা উত্তম। কিন্তু নফল ইবাদতের কারণে পরকালে জিজ্ঞাসিত হবে না যে, তুমি অমুক নফলটি কেন আদায় করনি। কারণ নফলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেউ করলে সওয়াবের অধিকারী হবে, না করলে গোনাহ নেই। কিন্তু হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকের বিষয়টি এমন যে, কিয়ামত দিবসে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসিত হবে এবং এর উপর জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ভরশীল।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রকৃত দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে অনেক অনেক সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কারো হক নষ্ট করেছে। কাউকে মন্দ বলেছে। কারো মনে কষ্ট দিয়েছে। এখন তার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে পরিমাণ সওয়াব সে নিয়ে এসেছিল, সবই অন্যদেরকে দিয়ে দিতে হয়েছে এবং অপরের গোনাহের বোঝা তার উপর পতিত হয়েছে। কাজেই হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকের ব্যাপরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (তিরমিযী)

হুকূকুল ইবাদ দ্বীনের তিন অংশ

আমি এর পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, 'ইসলামী ফেকাহ্' যাতে ইসলামী শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা হয়। একে যদি চার ভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে এর এক ভাগ ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত। আর অবশিষ্ট তিন ভাগে হুকূকুল ইবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ লেন-দেন এবং সামাজিকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা 'হেদায়া' কিতাবের

নাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন, যা ফিক্‌হে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব। এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড ইবাদত সম্পর্কিত। যাতে রয়েছে পবিত্রতা, নামায, রোযা, হজ্জের হুকুম-আহকাম। অবশিষ্ট তিন খণ্ডে রয়েছে লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিকতা তথা হুকূকুল ইবাদ সম্পর্কে আলোচনা। এর দ্বারা অনুমান করা যায় হুকূকুল ইবাদ দ্বীনের তিন চতুর্থাংশ। কাজেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এর উপর আমল করার নিয়তে শ্রবণ এবং পড়ার তাওফীক দান করুন। হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হককে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামপূর্ব যুগে নারীর অবস্থান

আল্লামা নববী (রাহঃ) স্বীয় কিতাবে প্রথম 'বাবুল ওসিয়্যাতু বিন্নিসা' দ্বারা আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ ঐ সকল নসীহতের মাধ্যমে শুরু করেছেন, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের হকসমূহের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর সর্বপ্রথম অধ্যায়ে এই আলোচনা এ জন্য এনেছেন যে, সবচেয়ে বেশী অনিয়ম এবং সবচেয়ে বেশী অবহেলা তাদের হকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বুকে ইসলাম আগমনের পূর্বে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা আসার পূর্বে নারীদেরকে মনুষ্য জাতির বাইরে কোন একটি জীব মনে করা হত। (নাউযুবিল্লাহ) আর তাদের সাথে আচরণ করা হত ভেড়া-বকরীর ন্যায়। মানুষ হিসেবে তাদের পাওনাটুকু আদায় করার ক্ষেত্রে কেউ এগিয়ে আসত না। তাদের হক আদায়ের বেলায় কোন পরওয়াই করা হত না। মনে করা হত ভেড়া-বকরীর পালের ন্যায় এদের অবস্থান। সুতরাং চতুষ্পদ জন্তু আর এদের সাথে আচরণে পার্থক্য করতে হবে কেন!

নারীর সাথে সদাচরণে ইসলাম

আসমানী হেদায়াত সম্পর্কে বে-খবর নারীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুললেন। মানুষকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।

আল্লামা নববী (রাহঃ) সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন, যে আয়াতটি এতদসম্পর্কিত সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। মহান আল্লাহর ইরশাদঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

এতে সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের নারীদের সাথে উত্তম আচরণ করে জীবন গোজরান করো। তাদেরকে কষ্ট দিও না। এটি একটি ব্যাপক ঘোষণা। এ আয়াত যেন এ বিষয়ের উপর সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোনাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে গেছেন। কারণ তিনি স্বয়ং পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ের সাবধানতা অবলম্বন করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآءِهِمْ وَاَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِىْ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করে। আর তোমাদের মাঝে আমি স্বীয় স্ত্রীগণের সাথে অধিক উত্তম আচরণকারী। (তিরমিযীঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর হক অধ্যায়-হাদীস নং ১১৭২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীগণের অধিকারের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের ব্যাপারে এরূপ গুরুত্ব প্রদান করতেন যে, অসংখ্য-অগণিত হাদীস থেকে এর প্রমাণ মিলে।

সুতরাং সর্বপ্রথম হাদীসটি হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

استوصو بالنساء خيرا فانهن خلق من ضلع وان اعوج شئ فى الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيرا

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে স্ত্রী জাতির সাথে সদ্ব্যবহার ও নরম ব্যবহার করার জন্য নসীহত করছি। তোমরা আমার এই উপদেশ স্মরণ রেখো এবং এই উপদেশ অনুযায়ী আমল করো। জেনে রেখো! স্ত্রী জাতিকে পুরুষের

পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হাড় হল উপরের হাড়, যা দ্বারা স্ত্রী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তোমরা তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তাকে সেভাবেই রেখে দাও, তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ গ্রহণ করো।

পবিত্র কুরআন শুধু মূলনীতি বর্ণনাকারী

আলোচনা সম্মুখে বাড়ার পূর্বে একটি কথা বলে দিতে চাই যে, সাধারণত: পবিত্র কুরআন যে কোন বিষয়ের শুধু মূলনীতি বর্ণনা করে থাকে। কোন বিষয়েই বিস্তারিত এবং খুঁটিনাটি আলোচনা করে না। এমন কি নামাযের ন্যায় দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনে যার নির্দেশ এসেছে ৭৩ স্থানে যে, নামায কায়েম করো। কিন্তু নামায কিভাবে পড়তে হবে, এর নিয়ম-পদ্ধতি কি হবে। কোন ওয়াক্তে কত রাকাত পড়তে হবে, কি কি কারণে নামায ভেঙ্গে যাবে, কোন কোন অবস্থায় নামায ভঙ্গ হবে না প্রভৃতি কিছুই পবিত্র কুরআনে আলোচনা করা হয়নি। এসব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি স্বীয় সুন্নাহর মাধ্যমে তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। এমনিভাবে যাকাতের ক্ষেত্রেও পবিত্র কুরআন যৎসামান্য আলোচনা করেছে, কিন্তু যাকাতের নেসাব কি পরিমাণ হবে, কাদের উপর যাকাত ফরজ হবে, কাদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে-এসব বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র কুরআন করেনি। বরং এখানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বোঝা গেল পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র উসূল বা মূলনীতি বাতলে দেয়, খুঁটিনাটি বা বিস্তারিত আলোচনায় যায় না।

পারিবারিক জীবন পূরা সমাজ-সভ্যতার ভিত্তি

কিন্তু নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও বংশীয় সম্পর্কের বিষয়টি এরূপ যে, পবিত্র কুরআন এর স্পর্শকাতর ও সাধারণ বিষয়গুলোও বিস্তারিত আলোচনা করেছে। একেকটি বিষয় প্রায় খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করেছে। অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন। এর কারণ কি? কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কের উপর ভিত্তি

করে গড়ে একটি সুখি-সমৃদ্ধশালী পরিবার, আর সেটাই হচ্ছে সুষ্ঠু সমাজের মূল বুনিয়াদ। এর উপর ভিত্তি করেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত গড়ে উঠে। যদি নারী পুরুষের সম্পর্কটি সুখ-শান্তিময় হয় এবং একে অপরের হক ঠিক মত আদায় করে যায়, তাহলে এর দ্বারা পারিবারিক জীবন সুষ্ঠু এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। পারিবারিক জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দময় হলে সন্তান-সন্ততিও সভ্য ও ভদ্র হয়। সন্তান-সন্ততি সভ্য ও ভদ্র হলে এর উপর নির্ভর করে একটি উন্নতর সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু যদি পারিবারিক জীবন অশান্তিময় হয়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয় বিনষ্ট। তাহলে এর প্রভাব সন্তান-সন্ততির উপর পড়ে। আর এর ফলে যে প্রজন্ম তৈরী হবে তাদের দ্বারা কিরূপ সমাজ গড়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোও বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা নারীর সৃষ্টিরহস্য

এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেটি এতই চমৎকার এবং বিজ্ঞচিত যে, এরূপ দৃষ্টান্ত মেলা ভার। ইরশাদ করেছেন-নারীদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর হযরত হাওয়া (আঃ)কে তাঁরই পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন আলেম এর অন্য ব্যাখ্যাও করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, নারীর দৃষ্টান্ত পাঁজরের ন্যায়। পাঁজরকে দেখতে যেমন বাঁকা দেখায়। আর এর সৌন্দর্য বা শোভা বাঁকা হওয়ার মাঝেই নিহিত। কাজেই যদি কেউ চায় পাঁজরকে দেখতে বাঁকা দেখা যায়, তাই চলো একে সোজা করে দেয়া হোক। তো একে সোজা করাতো সম্ভব হবে না, বরং সোজা করতে গেলে সেটা ভেঙ্গে যাবে এবং সেটা পাঁজর থাকবে না, বরং পুনরায় বাঁকা করে প্লাষ্টার করে জোড়া লাগাতে হবে। তাই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

ان ذهبت تقيمها كسرت ها

অর্থাৎ যদি তুমি এই পাঁজরকে সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে।

وان استمتعت بها استمعت بها وفيها عوج

অর্থাৎ যদি তুমি এর থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে একে স্ব-অবস্থায় রেখেই উপকৃত হতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উপমাটি আসলেও অত্যন্ত চমৎকার!

এটা নারীর জন্য দোষনীয় নয়

কেউ কেই এই উপমাটি নারী জাতির জন্য দোষনীয় বলে উল্লেখ করে থাকে যে, নারীকে বাঁকা হাড় দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বাঁকা। সুতরাং আমার নিকট অনেকের পত্র আসে, অনেকেই লিখে যে, নারী জাতিকে বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা যেন তাদের জন্য নিন্দনীয় ব্যাপার। অথচ স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনার উদ্দেশ্য এটা নয়।

বক্রতাই নারীর প্রকৃতি

আসল কথা হচ্ছে-আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে কতিপয় গুনাগুণ দিয়ে সৃজন করেনএবং নারীকেও কতিপয় গুনাগুণ দিয়ে সৃজন করেছেন। উভয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতার কারণে পুরুষেরা নারী জাতির ক্ষেত্রে ভাবে যে, সে আমার স্বভাব এবং প্রকৃতির পরিপন্থী। অথচ নারীর জন্য পুরুষের স্বভাবের পরিপন্থী হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ তার প্রকৃতির দাবীই হচ্ছে বক্রতা। কেউ যদি পাঁজরের বক্রতা দেখে বিস্ময় বোধ করে, তাহলে এটা তার জন্য ঠিক নয়। কারণ তার সৃষ্টির দাবীই হচ্ছে বক্রতা। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা স্ত্রী জাতির মাঝে এমন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করো, যা তোমার স্বভাব বিরোধী বলে মনে হয়, যার কারণে তুমি তাকে একগুয়ে মনে করছ, তাহলে এই কারণে তাকে তিরস্কৃত করো না।

'উদাসীনতা' নারীর শোভা

যমানা আজ পাল্টে গেছে। এ জন্য প্রতিটা বস্তুর মূল্যায়নের ধরনও পাল্টে গেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন এসেছে। যে গুণটি পুরুষের জন্য

দোষনীয়, প্রায়শ:ই সেটা নারীদের জন্য শোভা-সৌন্দর্য হয়ে থাকে। আমরা গভীর দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করলে পবিত্র কুরআনেই তা দেখতে পাব-যে গুণটি পুরুষের জন্য দোষনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেটা নারীদের বেলায় সৌন্দর্য হিসেবে ধরা হয়েছে এবং সেটাকে ভাল এবং উত্তম বলা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পুরুষের জন্য মুর্খ বা স্বল্প শিক্ষিত হওয়া, অলস হওয়া এবং দুনিয়া সম্পর্কে বে-খবর হওয়াকে দোষনীয় বলা হয়েছে। কারণ পুরুষের উপর আল্লাহ তা'আলা বাহির জগতের কর্মকাণ্ডের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ জন্যে তার নিকট পর্যাপ্ত এলেম বা জ্ঞান থাকা জরুরী। তাকে সচেতন হতে হবে। সে যদি সচেতন না হয়, বরং গাফেল-উদাসীন হয়, তাহলে এটা পুরুষের দোষনীয় ব্যাপার। কিন্তু গাফলত এটা নারীর শোভা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সূরায়ে নূরে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنٰتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(সূরায়ে নূর ঃ আয়াত-২৩)

অর্থাৎ যারা এমন নারীদের প্রতি অপবাদ লাগায়, যারা সতী-সাধ্বী এবং গাফেল অর্থাৎ দুনিয়া সম্পর্কে বে-খবর...।

এখানে পবিত্র কুরআন দুনিয়া সম্পর্কে বে-খবরীকে একটি ভাল গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। বোঝা গেল নারীরা দুনিয়ার বাহ্যিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বে-খবর থাকবে। অবশ্য নিজের প্রয়োজন পরিমাণ অবশ্যই অবগতি লাভ করতে হবে। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কে খুব বেশী না জানা এটা নারীর জন্য দোষনীয় নয়। বরং এটা একটা ভাল গুন। পবিত্র কুরআন যাকে ভাল গুণ হিসেবেই উল্লেখ করেছে।

জোরপূর্বক সোজা করার প্রয়াস চালিয়ো না

জানা গেল যেটি পুরুষের জন্য দোষনীয় ছিল, সেটা নারীর বেলায় দোষনীয় নয়। আর যেটি পুরুষের জন্য দোষনীয় নয়, সেটা কখনও নারীর জন্য দোষনীয় হয়ে দেখা দেয়। কাজেই যদি তোমরা তাদের মাঝে এমন কোন স্বভাব দেখতে পাও, যা তোমাদের দৃষ্টিতে দোষনীয়, কিন্তু নারীর জন্য দোষনীয় নয়, তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না। কারণ বাঁকা হাড় দ্বারা তৈরীর দাবীই হচ্ছে এই যে, স্বভাবগত দিক

দিয়ে উভয়ের মাঝে ভিন্নতা থাকবে। অতএব তাকে জোর করে সোজা করার চেষ্টা বৃথা।

ঝগড়ার মূল কারণ

এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা। কারণ নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে তাঁর অপেক্ষা অধিক আর কে জানতে সক্ষম। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের মূল কারণ নির্ণয় করে বলেন যে, তাদের মাঝে ঝগড়ার আসল কারণ হল, পুরুষ ব্যক্তিটি চায় আমি যেমন বা যে সকল গুণাবলীর অধিকারী আমার স্ত্রীও তেমনটি হবে। কিন্তু ভাই! সে তো এমনটি হওয়ার নয়। কারণ যদি তুমি তাকে তোমার মত বানাতে চাও, তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। কাজেই এ চিন্তা বাদ দিতে হবে। তবে যে সকল গুনাবলী তার মাঝে পরিবেশ-পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী এবং স্বাভাবিকভাবে থাকা উচিত, তা যদি না থাকে, তাহলে তার সংশোধন করতে চেষ্টা করো। আর এই সংশোধনও পুরুষের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তুমি যদি চাও সে তোমার মন-মেজাযের অনুরূপ হয়ে যাক, তাহলে তা আদৌ সম্ভব নয়।

তার কোন স্বভাব পছন্দনীয়ও হবে

এ অধ্যায়ের ২য় হাদীসটিও হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر

(ছহীহ মুসলিম, কিতাবুর রেজা', বাবুল ওসিয়্যাতু বিন্নিসা)

এ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আশ্চর্যজনক উসূল বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চান কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিন নারীর প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ রাখতে পারে না এবং সম্পূর্ণভাবে তাকে অপদার্থ ও তিরস্কৃত ভাবতে পারে না, এ কথা বলতে পারে না যে, তার মাঝে কোন ভাল গুণই নেই। কারণ তার কোন কাজ অপছন্দনীয় মনে হলেও তার অন্য পছন্দনীয় অবদানও তো রয়েছে।

প্রথম উসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন দুইজন মানুষ একসাথে বসবাস করে, তখন অপরজনের কতিপয়

কর্মকান্ড তার নিকট ভাল লাগে, কতিপয় অপছন্দনীয় মনে হয়। এটাই স্বাভাবিক-এটাই প্রকৃতির দাবী। কাজেই তার কোন কাজ অপছন্দীয় হওয়ার কারণে এ কথা বলা যাবে না যে, তার সবই খারাপ। বরং কখনো এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখিন হলে তার ভাল গুণগুলোর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করো, কারণ তার মাঝে কোন না কোন ভাল গুণতো অবশ্যই রয়েছে। ব্যাস ভাল গুনগুলো স্মরণ করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করো। এভাবে কাজ করতে পারলে আশা করা যায়, তার মাঝে যে মন্দ স্বভাবগুলো রয়েছে, সেগুলোর তেমন গুরুত্ব তোমার মন-মানসে অবশিষ্ট থাকবে না।

আসল কথা হচ্ছে-মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যদি স্ত্রীর কতিপয় কাজ অপছন্দনীয় হয়, তাহলেই হল। বলতে শুরু করে, তার মাঝে এই মন্দ স্বভাব রয়েছে; এই বদভ্যাস রয়েছে। তার ভাল স্বভাবগুলোর প্রতি তখন খেয়ালই থাকে না। ফলে সর্বদা জোরেশোরে তার খারাবী বর্ণনা করতে থাকে এবং পরিণামে তার সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে।

ভাল-মন্দ মিলেই সকল কিছুর সৃষ্টি

পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার মাঝে মন্দের দিক নেই এবং যার মাঝে কোন না কোন ভাল দিক নেই। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল কিছু এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রতিটা বস্তুর মাঝে ভাল এবং মন্দ উভয় দিক রয়েছে। এমন কোন বস্তু নেই, যার মাঝে শুধু মন্দই মন্দ। আবার এমন কোন বস্তু নেই যার মাঝে শুধু ভালই ভাল। বরং ভাল মন্দ মিলে সকল বস্তুর সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র এই দুনিয়ায় কেই কাফের কেউ মুশরিক, কেউ দুরাচার। আবার তাদের মাঝে সন্ধান করলেও কোন না কোন ভাল গুণ পাওয়া যাবে।

একটি ইংরেজী প্রবাদ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ রয়েছে এবং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে-' প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো ধন, সুতরাং যেখানেই তা পাবে তা লুফে নিবে'। সুতরাং ইংরেজী প্রবাদ হওয়ার কারণে যে তা ভুল প্রমাণিত হবে; এমনটি নয়। কারণ প্রবাদটি বড়ই জ্ঞানগর্ভ। কেউ বলেছে-' চলতে চলতে যে ঘড়িটি বন্ধ হয়ে গেছে, সেটিও সমগ্র দিন দু'বার সঠিক সময় বাতলায়।' উদাহরণ স্বরূপ ধরুন-

১২টা বেজে ৫ মিনিটে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন এ কথাতো সর্বসত্য যে সারাদিন সেটা সঠিক সময় বাতলাবে না। বরং ভুল সময়ই বাতলাবে। দিনে দু'বার সে সঠিক সময় বাতলাবে। এক-দুপুর ১২ টা ৫ মিনিটে। দুই- রাত ১২ টা ৫মিনিটে। এই দুইটা সময় সে সঠিক সময়ই বাতলাবে।

ভালাই সন্ধান করলে তা পাবেই

প্রবাদকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে-যতই বেকার অনর্থক বস্তু হোক, যদি তুমি তার মাঝে ভালাই সন্ধান কর, তাহলে অবশ্যই ভালাই পেয়ে যাবে। অতএব পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যার মাঝে কোন না কোন ভালাই নেই।

কুদরতের কারখানায় কোন মন্দ নেই

আব্বাজান হযরত মুফতী শফী' (রাহঃ) আল্লামা ইকবাল মরহুমের একটি কবিতা খুবই আবৃত্তি করতেন ঃ

نہین ہے چیز نکمی کوئ زمانے مین

کوئ برا نہین قدرت کے کارخانے مین

অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, স্ব-ইচ্ছায় এবং স্বীয় প্রজ্ঞায় সৃষ্টি করেছেন। গভীর দৃষ্টি ফেললে প্রতিটা বস্তুর মাঝে হেকমত এবং মঙ্গল দেখতে পাবে। কিন্তু মানুষের স্বভাব হচ্ছে, মানুষের দৃষ্টি শুধু মন্দের দিকেই অধিক ধাবিত হয়ে থাকে। ভালোর দিকে তাদের দৃষ্টি কমই যায়। ফলে সে বদদিল হয়ে অন্যায়-অবিচারে জড়িয়ে পড়ে।

নারী জাতির ভাল গুনাগুনের দিকে দৃষ্টি দাও

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

(সূরায়ে নিসা ঃ আয়াত ১৯)

অর্থাৎ যে নারীটির সাথে তুমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ, সে যদি তোমার নিকট পছন্দনীয় না হয়। কোন কারণে সে তোমার নিকট অপছন্দনীয় হলেও হতে পারে। তবে আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে অনেক মঙ্গল রেখেছেন। এ জন্য এরূপ ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তার ভাল গুণগুলোর

দিকে দেখ, এর দ্বারা তোমার মন-মানসে সান্ত্বনা পাবে ফলে খারাপ ব্যবহার করা থেকেও বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে।

জনৈক বুযুর্গের শিক্ষনীয় ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানভী (রাহঃ) জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লিখেন যে, উক্ত বুযুর্গের স্ত্রী অত্যন্ত ঝগড়াটে ছিলেন। সর্বদা বিবাদে লিপ্ত থাকতেন। বুযুর্গ ঘরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর স্ত্রীর অভিশাপ-ভর্ৎসনা আর ঝগড়ার তুফান বয়ে যেত। কেউ উক্ত বুযুর্গকে বলল, হযরত দিবারাত্র আপনি এই যন্ত্রণা কেন বয়ে চলছেন? এরূপ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সকল ঝামেলা চুকিয়ে নিলেই তো পারেন। বুযুর্গ উত্তরে বললেন, দেখ ভাই! তালাক দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করাতো খুবই সহজ। যে কোন সময় মনে চাইলে তা করা সম্ভব। কারণ ঝগড়ার অভ্যাস ছাড়াও তার মাঝে আরো অনেক খারাবী রয়েছে। কিন্তু তার মাঝে এমন একটি গুণও রয়েছে, যার কারণে আমি তাকে কখনো পরিত্যাগ করব না এবং তালাক দিব না। সেটি হচ্ছে তার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্যের এমন এক বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, যদি আমি ঘটনাক্রমে কখনো গ্রেফতার হয়ে ২৫ বছর পর্যন্ত জেলখানায় বন্দী থাকি, তাহলে আমার বিশ্বাস আমি তাকে যেখানে বসিয়ে রেখে যাব, সেখানেই সে বসে থাকবে। অন্য কারো দিকে সে চোখ তুলে তাকাবেও না। তার এই গুণটি এমন যার কোন মূল্য হতে পারে না।

হযরত মির্যা মাযহার জানেজানা (রাহঃ) এবং নাযুক মেযাজ

হযরত মির্যা মাযহার জানেজানা (রাহঃ)-এর নাম আপনারা শুনে থাকবেন হয়ত। অত্যন্ত বড় মাপের ওলীআল্লাহ ছিলেন তিনি। তিনি এতই নাযুক মেযাজ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, যদি কেউ সোরাহীর উপর গ্লাস বাঁকা করে রাখত, তাহলে তা দেখে ওনার মাথা ব্যাথা শুরু হয়ে যেত। বিছানা সামান্য কোকড়ানো থাকলে তাঁর ঘুম হত না, বরং মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু ঘটনাক্রমে হযরতের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত বদ স্বভাবের। সদাসর্বদা বকবক করতেন। বাচালের ন্যায় সর্বদা মুখে একটা না একটা কিছু বলতে থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় বান্দাদেরকে আজব পদ্ধতিতে পরীক্ষা

করে থাকেন এবং এর দ্বারা তাঁদের মর্তবা বৃদ্ধি করে থাকেন। এটাও ছিল হযরত মির্যা সাহেবের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। কিন্তু তিনি সমগ্র জীবন এই স্ত্রীর সাথে কাটিয়েছেন। তিনি বলতেন-আল্লাহ তা'আলা হয়ত এর দ্বারা আমার পাপসমূহ ক্ষমা করার ব্যবস্থা করবেন।

আমাদের সমাজের নারীরা এ জগতের হুর

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) বলতেন-আমাদের হিন্দুস্তান এবং ভারতের মহিলারা পার্থিব জগতের হুর। এর কারণ তিনি এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মাঝে আনুগত্যের গুন রয়েছে। কিন্তু যখন থেকে পশ্চিমা কৃষ্টি-সভ্যতার সয়লাব এদেশে অনুপ্রবেশ শুরু করেছে, তখন থেকে এই গুনটি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। নতুবা তাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের এমন স্বভাব রেখেছেন যে, যত কিছুই হোক কিন্তু তারা তাদের স্বামীর জন্য জীবন কুরবান করে দিতে দ্বিধা করে না। আর সাধারণত: তাদের দৃষ্টি স্বামী ব্যতীত অন্য কারো উপর যায় না।

মোটকথা সেই বুযুর্গ এই হাদীসের উপর আমল করে দেখিয়েছেন যেঃ

ان كره منها خلقا رضى منها آخر

অর্থাৎ স্ত্রীদের একটি বিষয় অপছন্দনীয় মনে হলেও অন্যটি পছন্দনীয় পাবে। সেদিকে খেয়াল করো এবং এর ফলে তার সাথে উত্তম আচরণ করো। সকল খারাবী এখান থেকেই আরম্ভ হয় যে, স্ত্রীদের শুধু মন্দ স্বভাবের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি যায়, ভাল স্বভাবে দিকে দৃষ্টি যায় না।

স্ত্রীকে প্রহার করা গর্হিত আচরণ

এই অধ্যায়ের তৃতীয় হাদীসটি হচ্ছে ঃ

عن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: العبد اخذكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه

(ছহীহ বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্ হাদীস নং ৫২০৪)

একদা এক ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আলোচনাই করলেন। তন্মধ্যে এই অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কথাটি তিনি বললেন তাহচ্ছে এই যে, তিনি বললেন- এটা অত্যন্ত গর্হিত কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় স্ত্রীকে এভাবে প্রহার করে, যেরূপ মনিব গোলামকে প্রহার করে থাকে। অপরদিকে আবার তার দ্বারা যৌন চাহিদাও মেটায়। এটা কত বড় বদ স্বভাব এবং আত্মমর্যাদাহীনতার কাজ যে, স্বীয় স্ত্রীকে গোলামের ন্যায় প্রহার করা।

স্ত্রীর সংশোধনের ৩টি স্তর

আমি পূর্বেই বলেছি যে, পবিত্র কুরআন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের হুকুম আলোচনার ক্ষেত্রেও গুরুত্ব প্রদান করেছে। স্ত্রীর কোন বিষয় অপছন্দনীয় মনে হলে পবিত্র কুরআন এর সমাধান দিয়েছে এই যে, যখন কোন মন্দ স্বভাব তার মাঝে দেখতে পাবে, তখন লক্ষ্য করলে অন্য ভাল গুণও তার মাঝে দেখতে পাবে। তারপরও যদি স্বামী মনে করে তার এমন কতিপয় মন্দ স্বভাব রয়েছে, যা অসহনীয়, তাহলেও সংশোধনের পথ রয়েছে। কারণ পুরুষকেও এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীর মাঝে যদি কোন মন্দ স্বভাব এবং সংশোধনযোগ্য কোন অভ্যাস দেখে তাহলে তার সংশোধনের ফিকির করবে। কিন্তু সংশোধনের সেই পদ্ধতি কি হবে? পবিত্র কুরআন তাও বাতলে দিয়েছে ঃ

وَاللّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ

(সূরায়ে নিসা ঃ আয়াত ৩৪)

সর্বপ্রথম তাকে নম্রতা, মহাব্বত ও ভালবাসার সাথে নসীহত করবে। এটা সংশোধনের প্রথম পর্ব। এভাবে নসীহতের দ্বারা যদি সে ফিরে আসে, তাহলে ব্যাস। আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না। যদি উপদেশ-নসীহতে তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে, তাহলে ২য় পর্বে তার সাথে শয্যা গ্রহণ পরিত্যাগ করবে অর্থাৎ বিছানা পৃথক করে ফেলবে। এর দ্বারা যদি সামান্য পরিবর্তন আসে, চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আসে, তাহলে আর কোন পদক্ষেপ নিবে না। (বিছানা পরিত্যাগ করার বিস্তারিত আলোচনা সামনে ভিন্ন হাদীসের আলোকে আসবে)।

স্ত্রীকে প্রহার করার সীমা

সংশোধনের ২য় পন্থাটিও যদি অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করবে। তা হচ্ছে প্রহার করা। কিন্তু প্রহারের পরিমাণ ও ধরন কেমন হবে? এ ব্যাপারে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে সর্বশেষ ওসীয়ত করেছেন, তাতে এই নসীহতও করেছেন- واضربوهن ضربا غيرمبرح অর্থাৎ প্রথমেতো প্রহারের প্রসঙ্গই আসা উচিত নয়। যদি আসেও তাহলে তখন, যখন প্রহার ব্যতীত আর উপায় অবশিষ্ট না থাকে। কারণ প্রহার করা এটা সংশোধনের সর্বশেষ উপায়। আর প্রহারের ক্ষেত্রে এই শর্ত রয়েছে যেন কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য না হয়, বরং সংশোধন করা উদ্দেশ্য হয়। কারণ কষ্টদানকারী এরূপ প্রহার বৈধ নয়, যার দ্বারা শরীরে দাগ পরে যায়। (প্রহার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ভিন্ন হাদীসের আলোকে সামনে আসবে)।

স্ত্রীদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদ্ব্যবহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পৃথিবী ত্যাগ করে মাওলার দরবারে চলে যান, ৯ জন পবিত্রাত্মা স্ত্রী তখন তাঁর বিবাহে ছিলেন। তাঁরা কেউ আকাশ থেকে পাঠানো ফেরেশতা ছিলেন না, বরং এই মাটির পৃথিবীর মানুষ এবং এই সমাজেরই সদস্য ছিলেন। তাঁদের মাঝে সে সকল ঘটনাও ঘটেছে, যা সাধারণত: সতীনদের মাঝে ঘটে থাকে। স্বামী স্ত্রীর মাঝে মান-অভিমানের যে ঘটনা সাধারণত: ঘটে থাকে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও ঘটেছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, সমগ্র জীবনে তিনি স্বীয় স্ত্রীগণের উপর কখনো হাত তুলেননি, উপরন্তু যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করতেন, তাঁর চেহারায় দেখা যেত মুচকি হাসিন ঝিলিক।

রাসূলের সুন্নত

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এটাই যে, স্ত্রীদের উপর হাত না তোলা। তবে হাত উঠানোর যে অনুমতি রয়েছে, তা একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। নতুবা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত তোলা বা প্রহার করার অনুমতি নেই এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতও এটা নয়।

সুন্নত সেটাই যা হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করলেন যে, সদা-সর্বদা তাঁর চেহারায় থাকত মুচকি হাসির ঝিলিক।

হযরত ডাক্তার সাহেবের কারামত

আমাদের হযরত ডাক্তার সাহেব (রাহঃ)কে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মর্তবা দান করুন আমীন। তিনি কখনো আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন- 'আমার বিয়ের আজকে ৫৫ বছর অতিক্রম হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! এই ৫৫ বছরের মাঝে আমি স্ত্রীর সাথে কখনো সুর পাল্টেও কথা বলিনি।'

আমি বলি যে, লোকেরা পানিতে সাতার কাটা আর বাতাসে বিচরণ করাকে কারামত মনে করে; কিন্তু আসল কারামত এটাই যে, ৫৫ বছর স্ত্রীর সাথে জীবন গোজরান করেছেন। আর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটাই এমন যেখানে নিশ্চিত মান অভিমানের ঘটনা ঘটে থাকে। এটা সম্ভবই নয় যে, দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মান অভিমানের কোন ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু আমাদের ডাক্তার সাহেব বলছেন 'আমি কখনো সূর পাল্টিয়েও কথা বলিনি'। এর পর আমাদের পীর আম্মা সাহেবা (রাহঃ) বলেন, সমগ্র জীবনে তিনি (ডাঃ সাহেব) কখনো এ কথা বলেননি যে, 'আমাকে এক.গ্লাস পানি পান করিয়ে দাও। অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে তিনি কখনো কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেননি যে, আমার অমুক কাজটা করে দাও। ফলে আমি নিজের পক্ষ থেকে সোৎসাহে সৌভাগ্য মনে করে তাঁর প্রতি খেয়াল রাখতাম এবং তাঁকে সহযোহিতা করতাম। কিন্তু সমগ্র জীবনে তিনি আমাকে কোন কাজ করে দেয়ার নির্দেশ দেননি।

খেদমত বিহীন তরীকত লাভ আদৌ সম্ভব নয়

হযরত ডাক্তার সাহেব (রাহঃ) বলেন, আমিতো আমার ব্যাপারে এ কথা বুঝে নিয়েছি এবং এর পূর্ণ বিশ্বাস রাখছি এবং এর উপরই জীবনের সমাপ্তি কামনা করছি যে, আমি একজন খাদেম বা সেবক। আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা খাদেম বা সেবক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এরূপ যত মানুষ রয়েছে, তাদের সকলের খেমতের দায়িত্ব আমার উপর। অন্যের সেবা গ্রহণের জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি, বরং আমি অপরের খাদেম। স্বীয় স্ত্রীরও সেবক আমি। সেবক নিজের সন্তান-সন্ততির,

মুরিদদের এবং আমার সাথে সম্পর্কশীল সকলের। কারণ বান্দার জন্য সেবকত্বের মর্তবা উত্তম। কাজেই আমি সেবক।' তিনি বলেন ঃ

زتسبیح و سجاده و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

তরীকত মূলত: সৃষ্টির সেবারই অপর নাম। তিনি বলেন, যখন আমি বুঝতে সক্ষম হলাম যে, আমি একজন খাদেম বা সেবক মাখদুম নই। তো একজন খাদেমের জন্য এটা কি করে শোভনীয় হতে পারে যে সে অন্যকে হুকুম করবে? অতএব সমগ্র জীবন এভাবেই জীবন অতিবাহিত করেছি। কখনো কোন প্রয়োজনের সম্মুখিন হলে নিজেই তা করে নিতাম। কাউকে বলতাম না।

এই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ। বাহ্যত: আমরাতো সুন্নতে নববীর অনুসরণ করে থাকি। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে, লেন-দেন, সামাজিকতায় এবং জীবন চলার প্রতি পদক্ষেপেও রাসূলের সুন্নতের অনুসরণ আবশ্যক।

শুধু দাবীই যথেষ্ট নয়

এত্তেবায়ে সুন্নত অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এর দ্বারা মানুষের দুনিয়ার জীবনও গঠিত হয় এবং পরকালীন জীবনও গঠিত হয় এবং জীবন শান্তি ও সুখময় হয়। তবে এটা শুধু মুখে মুখে দাবী করার দ্বারা অর্জিত হয় না।

وكل يدعى حبا ليلى

ذليلى لاتقرلهم بذاك

(অর্থাৎ লাইলার প্রেমের দাবীতো সকলেই করছে, কিন্তু স্বয়ং লাইলাতো সকলের দাবীর সমর্থন করছে না।) সুতরাং এটাও শুধু আমলের দ্বারা অর্জিত হয়। মানুষ নিজের চরিত্রে, কর্মকান্ডে এবং আমলে তা বাস্তবায়িত করবে। যার সাথে ন্যুনতম সম্পর্ক হয়ে যায়, সে সম্পর্কের দাবী হচ্ছে, তাকে নিজের পক্ষ থেকে সামান্য কষ্ট না দেয়া।

মোটকথা পবিত্র কুরআন স্ত্রীর সংশোধনের তৃতীয় যে পন্থাটি বাতলিয়েছে। তার ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের

জীবনে তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র জীবনে স্বীয় স্ত্রীগণের উপর হাত তুলেননি। চাই যতই অসন্তুষ্টিজনক কোন কাজ তারা করুক। আর যারা কথায় কথায় নিজের স্ত্রীদের উপর হাত তোলে তাদেরকে খারাপ মন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

عن عمروبن لاحوص الجشى رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكرو وعظ. ثم قال: الا واستوصوا بالنساء خيرا فانماهن عوانكم عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا أن يأتين بفاحشة مبينة الخر

(তিরমিযী, কিতাবুত্ তাফসীর, সূরায়ে তাওবা অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৮৭)

বিদায় হজ্জের ভাষণ

উপরোক্ত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ খুতবার কিছু সংকলন করা হয়েছে। এই ভাষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় প্রদান করেছিলেন। এতে তিনি স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, হয়ত এ বছর পর তোমাদের সাথে এখানে মিলিত হওয়ার সুযোগ আর পাব না। কাজেই উক্ত ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাচন করে করে সে সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা উম্মতের পথভ্রষ্ট এবং গোমরাহ হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। যার দ্বারা উম্মতের জন্য একটি জীবন পদ্ধতি সম্মুখে এসে যায় এবং উম্মতের বিপথগামী হওয়ার যত পথ রয়েছে, সে ভাষণে সে সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার পন্থা বাতলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিদায় হজ্জের সে ভাষণটা ছিল অনেক দীর্ঘ। কিন্তু সে ভাষণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে উল্লেখিত হাদীসটিও সেই ভাষণের একটি অংশ। যে অংশে বিশেষভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অত:পর বিশেষভাবে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে জেনে তার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের জন্য

তাগিদ করা হয়েছে। এখন আপনি তাদের হকসমূহের গুরুত্ব এর দ্বারা অনুমান করতে সক্ষম হবেন যে, তাদের হক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে এ পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যখন তাঁর মনে এই খেয়াল এসেছে যে, আগামীতে এভাবে সকল মানুষের সম্মুখে কথা বলার সুযোগ আর নাও হতে পারে।

সুতরাং পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে যে সকল বিষয় বিশষভাবে বলে যাওয়ার জন্যে নির্বাচন করেছেন এবং যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন, তন্মধ্যে নারী পুরুষের পারস্পরিক হকসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব

এর দ্বারা অনুধাবন করা গেল মানব জীবনে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা গুরুত্বের দাবী রাখে এবং স্বয়ং শরীয়ত প্রবক্তা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। কেননা যদি স্বামী স্ত্রী একে অপরের হকসমূহ যথাযথ আদায় না করে , বরং আপোষে ঝগড়া-বিবাদে কোমর বেঁধে নেমে যায়, তাহলে এর দ্বারা শুধু তাদের একে অপরের অধিকারই বিনষ্ট হবে না, বরং এর প্রভাব উভয় পরিবারে পড়বে। পড়বে সন্তানদের উপর। ফলে সন্তান-সন্ততি দুরাচার ও দুষ্ট হবে। আর যেহেতু সমাজ-সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠে পরিবার ও খান্দানের উপর নির্ভর করে, তাই এর দ্বারা সমগ্র সমাজের পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে। এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এর উপর আলোকপাত করেছেন।

স্ত্রীরা তোমাদের নিকট কয়েদিসম

হযরত আমর ইবনুল আহ্ওয়াশ জাশী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সে ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন নসীহত প্রদান করেন। অত:পর বলেন, তোমরা খুব ভাল করে শুনে রাখ! আমি তোমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের নসীহত করছি। তোমরা এই নসীহত গ্রহণ করো। পিছনের হাদীসটিতে এটাই উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- فانما هن عوان عندكم অর্থাৎ তাঁরা তোমাদের নিকট

কয়েদিসম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে নারীর এমন একটি গুণ বর্ণনা করেছেন, যদি পুরুষেরা শুধু এই একটি গুন নিয়ে ভাবে, তাহলে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করার খেয়ালও মনে ঠাঁই দিবে না।

এক অবলা নারী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) বলতেন যে, একজন অবলা মুর্খ নারী থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। সে শুধু দু'টি কথা বলে এক জনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিচ্ছে। একজন বলল, আমি বিয়ে করলাম। আর অপরজন বলল, আমি কবুল করলাম। শুধু এ কথা দু'টির সম্মান সে এমনভাবে বজায় রেখেছে যে, সে তার মাকে পরিত্যাগ করেছে, পিতাকে পরিত্যাগ করেছে, ভাই-বোনকে পরিত্যাগ করেছে, পরিত্যাগ করেছে নিজের বংশ এবং এলাকাকে। সে এখন সম্পূর্ণ স্বামীর হয়ে গেছে। স্বামীর গৃহকে সে সম্পূর্ণ আপন করে নিয়েছে। মাত্র দু'টি কথার সম্মান সে এভাবে বজায় রেখে সে এ পরিমাণ আনুগত্য দেখিয়েছে। হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন, এক অবলা নারী দু'টি কথার সম্মান বজায় রাখতে এত কিছু করতে পারল, সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একজনের হয়ে গেল, কিন্তু তোমরা দু'টি কথা অর্থাৎ لا اله الا الله محمد رسول الله পড়ে সেই আল্লাহর হতে পারলে না, যার জন্য তোমরা এই কালেমা পড়েছ। তোমাদের অপেক্ষা সেই অবলা নারী কতইনা উত্তম, যে মাত্র দু'টি কথার সম্মান রাখতে গিয়ে সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছে।

স্ত্রীরা তোমাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে

উল্লেখিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, দেখ স্ত্রীরা তোমাদের খাতিরে কত ত্যাগ স্বীকার করছে। যদি এর উল্টো করা হত এবং তোমাদেরকে বলা হত যে, বিয়ের পর তোমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পরিত্যাগ করতে হবে। তোমাদের মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তখন এটা তোমাদের জন্য কতইনা কষ্টের হত। অথচ এক অপরিচিত পরিবেশ, অপরিচিত ঘর, অপরিচিত মানুষের সাথে জীবন গোজরান করার জন্য সে নিজেকে বন্দী করে নিয়েছে। কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমরা কি তার এই ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ন করবে না? সুতরাং তার এই ত্যাগের মূল্য দাও এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করো।

তোমাদের আর কোন দাবী নেই

এর পর তিনি অত্যন্ত কঠিক একটি বাক্য বলেছেন, যখনই এই বাক্যের ব্যাখ্যা করা হয়, তখন পুরুষেরা অসন্তুষ্ট হয়ে যান। সে বাক্যটি হচ্ছে ঃ

ليس تملكون منهن شيئا غير ذالك

অর্থাৎ তার উপর তোমাদের শুধু এতটুকু অধিকার যে, সে তোমাদের গৃহে অবস্থান করবে। এ ছাড়া শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার উপর তোমাদের আর কোন দাবী নেই।

খানা প্রস্তুত করা স্ত্রীদের দায়িত্ব নয়

এর উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম এই মাসআলা বর্ণনা করেন, যা অত্যন্ত নাযুক। যা বর্ণনা করার দ্বারা অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন। তা হচ্ছে এই যে, স্বামীর গৃহের খানা প্রস্তুত করা স্ত্রীর শর'য়ী দায়িত্ব নয়। অর্থাৎ শরীয়তের পক্ষ থেকে তার উপর এ দায়িত্ব বর্তায় না। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন যে, মহিলারা সাধারণত: দুই প্রকৃতির হয়ে থাকে। এক- যারা স্বীয় পিতা-মাতার বাড়ীতেও ঘরের কাজ-কর্ম করায় অভ্যস্ত বা করে থাকে। দুই–যারা নিজের পিতার বাড়ীতে খানা প্রস্তুত করার কাজটুকুও করে না, বরং লোক দিয়ে করিয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের মহিলাদের জন্য বিয়ের পর স্বামীর গৃহে এসে খানা প্রস্তুত করা তার উপর কোনভাবেই ওয়াজিব নয়। শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়, আইনগতভাবেও নয়, সততা হিসেবেও নয়। বরং এরূপ নারী তার স্বামীকে বলতে পারবে, খানা প্রস্তুত করার শর্ত ব্যতিরেকেই আমার ভরণ-পোষণ আপনার উপর ওয়াজিব। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরাম লিখেন ঃ

يأتها بطعام مهيئا

অর্থাৎ এ অবস্থায় স্ত্রীর জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য সংগ্রহ করে দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। স্বামী স্ত্রীর নিকট আইনগভাবে খাদ্য প্রস্তুত করার দাবী করতে পারবে না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কারভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ ليس تملكون منهن شيئا غير ذالك

অর্থাৎ স্ত্রীর উপর তোমার এ অধিকার রয়েছে যে; তুমি তাকে স্বীয় গৃহে রাখবে। তোমার অনুমতি ব্যতীত সে ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু

এ ছাড়া তার উপর শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার আর কোন দাবী নেই। আর যদি প্রথম প্রকৃতির মহিলা হয়, অর্থাৎ যে নিজের পিতার বাড়ীতে খাবার তৈরীর কাজ করে এবং সে স্বামীর ঘরে আসে, এরূপ মহিলার জন্যও খাবার তৈরী করা আইনগতভাবে ওয়াজিব নয়। তবে সততার খাতিরে খাবার তৈরী করা ওয়াজিব। অর্থাৎ আইনী দৃষ্টিকোণ্ থেকে তার পক্ষ থেকে খাবার তৈরীর জন্য দাবী করা যাবে না। অবশ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজের খাবার নিজে তৈরী করা। এ অবস্থায় স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে তিনি খাবার তৈরীর যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিবেন। তবে স্বামী এবং সন্তানদের জন্য খাবার প্রস্তুত করা এটা তার দায়িত্ব নয়। আর এরূপ মহিলা স্বামীকেও এ কথা বলতে পারবে না যে, আমার জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার সংগ্রহ করে দিন। কিন্তু সে যদি স্বামী এবং সন্তানদের জন্য খাদ্য তৈরী করতে অস্বীকার করে, তাহলে আদালত তাকে জোর করে এর জন্য বাধ্য করতে পারবে না। ফুকাহায়ে কেরাম অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত ওয়াজিব নয়

আরো একটি বিষয় জেনে নেয়া উচিত, যেটি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকে। তা হচ্ছে-স্ত্রীর জন্য স্বামী এবং সন্তানের খাবার তৈরীই যেখানে ওয়াজিব নয়, সেখানে স্বামীর মাতা-পিতা, ভাই-বোনের জন্য খাবার তৈরী করা এবং তাদের খেদমত করাও ওয়াজিব নয়। আমাদের সমাজে এই রীতি চালু রয়েছে যে, সন্তানকে বিয়ে করানোর পর বাবা-মা মনে করেন, পুত্রবধুর উপর আমাদের সন্তানের হক পরে, প্রথম আমাদের হক। সুতরাং আমাদের হক অবশ্যই আগে আদায় করবে। স্বামীর খেদমত করুক চাই না করুক। এর ফলে বউ-শাশুড়ী এবং ভাবী ননদের মাঝে ঝগড়া দানা বেঁধে উঠে। আর এই ঝগড়ার ফলে সমাজে যা কিছু হচ্ছে, তা আপনার আমার সম্মুখেই রয়েছে।

শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত সৌভাগ্যের বিষয়

খুব ভাল করে স্মরণ রাখুন! যদি পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে সেটা সন্তানের উপর ওয়াজিব এবং সন্তান নিজে তাদের খেদমত করবে। অবশ্য পুত্রবধু যদি সৌভাগ্য মনে করে স্বামীর পিতা-মাতার খেমদত আনন্দচিত্তে করে, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় পিতা-মাতার খেদমত করার জন্য বাধ্য করতে পারবে না, যতক্ষণ না

সে নিজের পক্ষ থেকে আনন্দচিত্তে না করবে। অদ্রুপ শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্যও জায়েয নেই পুত্রবধুকে তাদের খেদমতের জন্য বাধ্য করা। তবে পুত্রবধু স্ব-ইচ্ছায় আনন্দচিত্তে যে পরিমাণ খেদমত করবে, সে পরিমাণ তার সওয়াব বৃদ্ধি হবে ইনশাআল্লাহ। আর পুত্রবধুর উচিৎও তা করা। যেন ঘরে সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকে।

পুত্রবধুর খেদমতের মূল্যায়ন করতে হবে

কিন্তু পাশাপাশি শ্বশুর এবং স্বামীকেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যদি স্ত্রী তাদের যথাযথ খেদমত আঞ্জাম দেয়, তাহলে এটা তার উত্তম আচরণ এবং উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কারণ এটা তার দায়িত্ব ছিল না। অতএব তার এই খেদমতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাকে এর প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ বিষয়গুলো না বোঝার কারণে আজকে ঘরের পর ঘর পরিবারের পর পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। বউ-শাশুড়ী এবং ননদ-ভাবীর ঝগড়ার ফলে বহু পরিবার বিরান হচ্ছে। তা সবই এ জন্যে হচ্ছে যে, তাদের অধিকারসমূহের যে পরিসীমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা আমাদের সম্মুখে অনুপস্থিত।

একটি আজব ঘটনা

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই সাহেব (রাহঃ) একদিন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন- 'জনৈক ব্যক্তি আমার সাথে সম্পর্ক রাখত। তার স্ত্রী সহ সে আমার এখানে যাতায়াত করত। এভাবে আমার সাথে তার এসলাহী সম্পর্ক গড়ে উঠে। একদা উভয়ে মিলে তাদের গৃহে আমাকে দাওয়াত করল। আমি তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে একদিন উপস্থিত হলাম। খাওয়া দাওয়া করলাম। খানাটা খুবই মজদার লাগল।'

ডাক্তার আবদুল হাই সাহেবের অভ্যাস ছিল, কোথাও খানা খেলে খাওয়ার পর খানা প্রস্তুতকারীর খুব প্রশংসা করতেন। বলতেন-তুমিতো চমৎকার খানা পকিয়েছো! এটা তিনি এ জন্য করতেন, যাতে খানা প্রস্তুতকারীর হিম্মত বাড়ে এবং মনে আনন্দ পায়।

সেদিনও তিনি খানা থেকে ফারেগ হলে সে মহিলা পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়াল এবং হযরতকে সালাম জানালে হযরত বললেন, তুমিতো অত্যন্ত চমৎকার এবং মজাদার খানা পাকিয়েছো! খুব তৃপ্তি সহকারে খানা খেলাম।

হযরত বলেন, এ কথা বলার সাথে সাথে উক্ত মহিলা ফুঁফিয়ে কাঁদতে শুরু করল। তার কান্নার আওয়াজ শুনে আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। কারণ আমি বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলাম না আমার কোন্ কথায় সে কষ্ট পেল এবং কি কারণে তার মনে আঘাত লাগল। তাই জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হল? তুমি কাঁদছ কেন? মহিলা অনেক কষ্টে নিজের কান্না চেপে রেখে বলল হযরত! আজ ৪০টি বছর যাবত স্বামীর সাথে জীবন গোজরান করছি, কিন্তু এই দীর্ঘ জীবনে একটি বারও তার মুখ থেকে এ বাক্যটি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি যে 'আজকের খানা ভাল হয়েছে'। তাই আজকে আপনার মুখ থেকে এ বাক্যটি শুনে আমি কান্না সংবরণ করতে পারিনি।

এরূপ ব্যক্তি প্রশংসা করতে পারে না

হযরত অধিকাংশ সময় এ ঘটনাটি শুনিয়ে বলতেন, এরূপ ব্যক্তির জন্য কখনো এমনটি করা সম্ভব নয়, যার মনে এই অনুভূতি রয়েছে যে, স্ত্রী খানা পাকানোর যে দায়িত্ব পালন করছে, এটা তার উত্তম আচরণের বহিঃপ্রকাশ। আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে নিজের দাসী এবং খাদেম মনে করে এবং ভাবে এটাতো তার আবশ্যিক কর্তব্য। খাবার প্রস্তুত করা তার কর্তব্য। সুতরাং উত্তমভাবে খানা পাকালে এটা তার জন্য প্রশংসার কি রয়েছে? এরূপ ব্যক্তির জন্য স্ত্রীর প্রশংসা করা আদৌ সম্ভব নয়।

স্বামী তার মাতা-পিতার খেদমত স্বয়ং করবে

একটি প্রশ্ন এখানে এই হয় যে, যদি মাতা-পিতা দুর্বল হয় এবং তাদের খেদমত করার প্রয়োজন পড়ে আর ঘড়ে শুধু ছেলে আর ছেলে বউ রয়েছে। এমতাবস্থায় কি করতে হবে। এমতাবস্থায় মাসআলা হচ্ছে, মাতা-পিতার খেদমত করা পুত্রবধুর উপর ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ যদি পুত্রবধু শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করে, তাহলে এটা তার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং এর জন্য সে অনেক সওয়াব ও প্রতিদানের অংশীদার হবে। কিন্তু স্বামীর মনে করতে হবে এটা আমার কাজ। আমার পিতা-মাতার সেবা করা এটা আমার কর্তব্য। এখন চাই সে নিজে করুক চাই তাদের খেদমতের জন্য কোন লোক রেখে দিক। আর তার স্ত্রী খেদমত করলে এটা তার উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনে করতে হবে।

নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাওয়া বৈধ নয়

পাশাপাশি আরো একটি বিধান জেনে নিন, নতুবা সকল কিছু একমুখী হয়ে যাবে। কারণ মানুষের স্বভাব হচ্ছে, এক দিকের কথা শুনেই এর দ্বারা অন্যায়ভাবে ফায়দা লুটতে থাকে। যেরূপভাবে আমি বিস্তারিত আলোচনা করলাম যে, খাবার প্রস্তুত করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়, অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন, স্ত্রীরা তোমাদের নিকট কয়েদীসম। যার অর্থ হচ্ছে তোমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীদের জন্য কোথাও যাওয়া জায়েয নেই। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরাম যেমনিভাবে খাবার প্রস্তুতের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা সহকারে বাতলে দিয়েছেন, তদ্রুপ এখানেও এ বিধান বলে দিয়েছেন যে, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা বাড়ীর বাইরে কিংবা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করতে যেতে পারবে না। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বীয় মাতা-পিতার সাথে দেখা করতে যেতেও নিষধ করা হয়েছে। অবশ্য যদি মাতা-পিতা নিজের মেয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার জন্য আসে, তাহলে স্বামী তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে স্ত্রীকে নিষেধ করতে পারবে না। তবে ফুকাহায়ে কেরাম এখানে পিতা-মাতার দেখা করতে আসার সীমাও বাতলে দিয়েছেন যে, পিতা-মাতা সপ্তাহে একবার দেখতে আসবে এবং দেখা-সাক্ষাত করে যাবে। এটা স্ত্রীর অধিকার। এ ক্ষেত্রে স্বামী তাকে বাধা প্রদান করতে পারবে না। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত বাইরে যাওয়া স্ত্রীর জন্য কোনভাবেই বৈধ নয়।

অতএব আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মাঝে সমতা বিধান করে দিয়েছেন যে, স্ত্রীর জন্য আইনগতভাবে খাবার তৈরী করাও ওয়াজিব নয়, অপরদিকে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।

উভয়ে মিলে জীবনতরী চালিয়ে নিবে

এ পর্যন্ত যা বলা হল তা হচ্ছে, আইনী ব্যাপার। কিন্তু উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, উভয় উভয়ের সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে। হযরত আলী (রাযিঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) উভয়ই ভিতর বাইরের সকল কাজ ভাগ করে নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) ঘরের বাইরের সকল কাজ আ াম দিতেন আর হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ঘরের ভিতরের সকল কাজ সমাধা করতেন। আর এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। এর

উপর প্রতিটা মুসলমানের আমল করা উচিত। প্রত্যেকেই যদি আইনী সীমার ভিতর অবস্থান করে, তাহলে হবে না বরং স্বামী স্ত্রীর সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জীবনকে আনন্দ ও সুখময় করে তুলবে। আর এভাবেই জীবন তরী চালিয়ে নিতে হবে।

যদি নারী নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়

إِلَّا أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ..

হ্যাঁ, যদি নারীরা প্রকাশ্য কোন নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তা কোন অবস্থাতেই বরদাশ্‌ত করা যেতে পারে না। এরূপ অবস্থায় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উপদেশ অনুযায়ী সর্বপ্রথম নসীহত করবে। এর পরও যদি সংশোধন না হয়, ফিরে না আসে, তাহলে বিছানা পৃথক করে দাও। তারপরও যদি সংশোধন না হয় এবং নির্লজ্জতা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে একান্ত অপারগতাবশত: প্রহারের অনুমতি রয়েছে। তবে প্রহারের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে-তা যেন অধিক কষ্টদায়ক না হয়। এরপর যদি সংশোধন হয়ে যায় এবং স্বামীর আনুগত্য মেনে নেয়, তাহলে আর কোন পন্থা খোঁজার চেষ্টা করা ঠিক নয় অর্থাৎ আর কোনভাবে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

"الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن"

'খবরদার! সে সকল নারীদের ব্যাপারে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের অন্ন, বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা তোমাদের উপর ওয়াজিব, সে সব প্রদানের ক্ষেত্রে তোমরা উদারতার পরিচয় দাও। শুধু একান্ত প্রয়োজন পূরা করেই শেষ করো না, বরং উদারতা ও প্রশস্তমনার সাথে কাজ করো।

স্ত্রীদের পকেট খরচা আলাদা প্রদান করবে

এ প্রসঙ্গে এখানে আরো দু' একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, যা হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) প্রায় স্থানেই তাঁর মাওয়ায়েজে উল্লেখ করেছেন। আর সাধারণত: এই বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম কথাটি যা হযরত থানভী (রাহঃ) উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে ভরণ পোষণ শুধু এই নয় যে, অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। বরং ভরণ পোষণের একটি অংশ এটাও যে, অন্ন বস্ত্রের পাশাপাশি কিছু নগত অর্থ স্ত্রীর পকেট খরচার জন্য তার হাতে

দিয়ে রাখবে। যা সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমত খরচ করতে পারবে। কেউ কেউ শুধু অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা করে কিন্তু পকেট খরচার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অথচ স্ত্রীকে পকেট খরচা প্রদান করাও আবশ্যক। কারণ মানুষের অনেক বিষয় এমন রয়েছে যা প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। অথবা তা বর্ণনা করতে মুস্কিল মনে করে। এ জন্যে স্ত্রীর হাতে অতিরিক্ত কিছু অর্থ থাকা আবশ্যক, যেন হঠাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্যের মুখাপেক্ষি না হতে হয়। আর এটাও ভরণ-পোষণের অন্তর্ভুক্ত। হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে এরূপ খরচা প্রদান না করে, সে এটা ভাল করে না।

খরচা প্রদানের ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দেয়া চাই

দ্বিতীয় হচ্ছে-পানাহারের ক্ষেত্রে ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। এমন না হয়, শুধু প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার মত জীবন ধারনের ব্যবস্থা করলে। বরং তার উপর এহসান করো। এহসানের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-স্বীয় আয় অনুসারে স্বচ্ছলতা এবং উদারতার সাথে স্ত্রীকে খরচা প্রদান করবে। কারো কারো মনে সংশয় থাকে যে, শরীয়তে এক দিকে অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, অপরদিকে এই হুকুম জারী করেছে যে, খরচের ক্ষেত্রে কৃপণতা করো না, বরং উদারতা এবং প্রশস্ত মন নিয়ে খরচ করো। এখন প্রশ্ন হয় এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা কি? কোন ধরনের খরচ অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত আর কোন ধরনের খরচ অপব্যয়ভুক্ত নয়?

বাসস্থান এবং আরাম-আয়েশ বৈধ

এই সংশয়ের জবাবে হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন, ঘর বা বাসস্থানতো তাই, যা বসবাসযোগ্য। যথা কেউ একটা ঝোপড়ীর ন্যায় তৈরী করল। সেখানে সে বসবাস করতে পারে। এ হল প্রথম পর্যায়ের বাসস্থান, যা সম্পূর্ণভাবে বৈধ। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে-যেখানে বসবাসও হল আবার আরাম আয়েশও হল। যথা কেউ মজবুত বাড়ী বা বিল্ডিং তৈরী করল। তাতে সে আরাম-আয়েশের সাথে বসবাস করতে পারবে। আর এরূপ বাসস্থানে আরাম-আয়েশের জন্য বাড়তি ব্যবস্থাও করল। এটা নাজায়েয নয় এবং এটা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এক ব্যক্তি ঝোঁপড়ীতে বসবাস করতে পারছে। আরেক ব্যক্তি পারছে না। তার জন্য মজবুত বাড়ীর প্রয়োজন। আবার সে বাড়ীতে বিদ্যুত প্রয়োজন। ফ্যান প্রয়োজন। গ্যাস প্রয়োজন।

এখন যদি তার এই বাড়ীতে আরাম-আয়েশের জন্য বিদ্যুৎ-পাখা ইত্যাদি ব্যবহার করে, তাহলে তা অপব্যয় বলে গণ্য হবে না।

শোভা-সৌন্দর্য অবৈধ নয়

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে-আরাম আয়েশের পাশাপাশি কিছু সাজ-সজ্জাও হল। যথা এক ব্যক্তির মজবুত বাড়ী রয়েছে। ওয়ারিং করা বিদ্যুৎ রয়েছে এবং পাখা রয়েছে, কিন্তু সে বাড়ীতে রং-চুনা করেনি। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ বাড়ীতে বসবাসতো অবশ্যই করা যাবে, কিন্তু রং-চুনা ব্যতীত শোভা-সৌন্দর্য হবে না। এখন যদি কোন ব্যক্তি সৌন্দর্যের জন্য রং-চুনা করে, তাহলে এটাও শরীয়তে জায়েয আছে।

মোটকথা হচ্ছে-বাসস্থান, আরাম-আয়েশ এবং শোভা-সৌন্দর্য জায়েয। সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-মনের খুশি বা আনন্দের জন্য কোন কাজ করা। যাতে দেখতে ভাল লাগে। মনে আনন্দ অনুভূত হয়। তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। শরীয়তে এর অনুমতি রয়েছে।

প্রদর্শনী জায়েয নয়

এরপর চতুর্থ স্তর হচ্ছে-প্রদর্শনী। অর্থাৎ যে কাজ করা হচ্ছে, তার দ্বারা আরাম-আয়েশ উদ্দেশ্য নয় এবং সৌন্দর্যও উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে-লোকেরা আমাকে বিত্তবান মনে করবে, সম্পদশালী ভাববে। মনে করবে তার নিকট অনেক অর্থ-সম্পদ রয়েছে। এর দ্বারা সে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। নিজের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করবে। এ সবই প্রদর্শনী বা লোক দেখানো। এটা জায়েয নয়, বরং এটা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

অপব্যয়ের সীমা

এ চারটি স্তর পানাহার, পরিধেয় এমনকি সকল বস্তুতে রয়েছে। এক ব্যক্তি দামী কাপড় পরিধান করল এ জন্যে যে, এর দ্বারা সে আরাম অনুভব করবে, তার নিকট ভাল লাগবে, তার গৃহবাসীর নিকট ভাল লাগবে এবং সাক্ষাত প্রার্থীরা দেখে খুশি হবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি দামী পোশাক পরিধান করে এ নিয়তে যে, আমাকে সম্পদশালী মনে করবে এবং আমাকে উঁচু স্তরের মানুষ মনে করা হবে, তাহলে এটা হবে প্রদর্শনী বা লোক দেখানো। এটা নিষিদ্ধ। এ জন্যেই হযরত থানভী (রাহঃ) অপব্যয়ের একটি সীমা-রেখা বাতলে দিয়েছেন যে, যদি প্রয়োজনের জন্যে খরচ করা হয়,

অথবা আরাম-আয়েশের জন্য খরচ করা হয়, কিংবা নিজের মনকে খুশি করতে গিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খরচ করা হয়, তাহলে সেটা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এটা অপব্যয় নয়

আমি একদা অন্য একটি শহরে অবস্থান করছিলাম। কাজ সেরে করাচী ফিরতে হবে। গরমের মৌসুম ছিল। একজনকে বললাম, ইয়ারকন্ডিশন কোচে আমার টিকেট বুক করে দাও এই বলে তাকে টাকা দিয়ে পাঠালাম। আমার পাশে বসা একজন বলে উঠল, জনাব এটাতো আপনি অপব্যয় করছেন। কারণ ইয়ারকন্ডিশন কোচে সফর করাতো অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। এমনটি অনেকেই মনে করে থাকে যে, উঁচু স্তরের যানবাহনে ভ্রমণ করা অপব্যয়। খুব ভাল করে মনে রাখুন! যদি উচুঁ স্তরে যানবাহনে সফর করা দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, প্রশান্তি লাভ। যথা গরমের মৌসুম। গরম বরদাশ্‌ত করায় অভ্যস্ত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা দান করেছেন, তাহলে এরূপ অবস্থায় উঁচু স্তরের যানবাহনে ভ্রমণ করা গোনাহ্ এবং অপব্যয় হবে না। হ্যাঁ যদি ইয়ারকন্ডিশনে ভ্রমণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় এই যে, লোকেরা আমাকে ধনী বলবে, বিত্তশালী বলবে, তাহলে এরূপ স্থলে অপব্যয় অবৈধ হবে এবং এটা তখন প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর জন্য হবে। একই ব্যাখ্যা পানাহার এবং পরিধেয় বস্তুর ক্ষেত্রেও।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা ভিন্ন ভিন্ন

সুতরাং স্বামীর উচিত এ সকল স্তরের প্রতি দৃষ্টি রেখে স্ত্রীর ভরণ পোষণ উদারতার সাথে প্রদান করা। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আমার হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান সাহেব (রাহঃ) একদা আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, ভাই! এমনও মানুষ রয়েছে যার অগ্র-পশ্চাতের কোন টান নেই। অর্থাৎ না তার কোন আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, না পাড়া-প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তার ঘরে একটি বিছানা, একটি থালা, একটি চামচা হলেই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত সামগ্রী তার জন্য প্রদর্শনী ব্যতীত আর কিছুই হবে না এবং সেটা তার জন্য অপব্যয় হবে। কিন্তু আরেক ব্যক্তি, যার ঘরে অহরহ মেহমান আসে, যার সম্পর্ক বিস্তৃত। বন্ধু-বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী অনেক। এরূপ ব্যক্তির স্বচ্ছলতার

সীমা ভিন্ন। এরূপ ব্যক্তির ঘরে কখনও ডজন ডজন সামগ্রী থাকলেও তাকে অপব্যয় বলা যাবে না। কারণ সবই তার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা হয় প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছলতা ভিন্ন ভিন্ন।

এ মহলে আল্লাহর সন্ধানকারী নির্বোধ

লোকেরা কখনও কখনও হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)-এর উপমা পেশ করে থাকে। যিনি এক সময় অনেক বড় বাদশা ছিলেন। তাঁর ঘটনা হচ্ছে-বাদশাহ থাকা অবস্থায় একদা তিনি রাতের বেলা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে রাজ মহলের ছাদের উপর পায়চারী করছে। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) ধরে এনে জিজ্ঞেস করলেন, এ রাতের বেলা তুমি রাজ মহলের ছাদের উপর কি করছ? সে ব্যক্তি বলল, আমার উটটি হারিয়ে গেছে, তাই উটের সন্ধানে এখানে এসেছি। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, আরে নির্বোধ! বেকুফ! রাতের বেলা তুমি রাজ মহলের ছাদের উপর উটের সন্ধান করছ? এখানে তুমি উট পাবে কোথায়?

সে ব্যক্তি আশ্চর্য জিজ্ঞেস করল, এখানে উট পওয়া যাবে না?

হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) বললেন, আরে মিয়া এখানে তুমি উট পাবে কোথায়?

সে ব্যক্তি বলল, যদি রাজ মহলে উট পাওয়া না যায় এবং এখানে উট সন্ধানকারী নির্বোধ হয়, তাহলে জেনে রাখুন! আপনি এখানে বসে যে খোদাকে সন্ধান করছেন, এখানে বসে খোদাকেও পাওয়া যাবে না। আর আমি এখানে উট সন্ধান করে যদি নির্বোধ হয়ে থাকি, তাহলে আপনি আমার চেয়ে বড় নির্বোধ। এটুকু বলে সে চলে গেল।

এদিকে হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)-এর মনে তার কথাগুলো প্রচন্ড আঘাত করল এবং তখনি রাজত্ব ছেড়ে তিনি জঙ্গলে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ভাবলেন, এখন শুধু আল্লাহর স্মরণে সময় কাটিয়ে দিব। তাই তিনি একটি বালিশ এবং একটি পেয়ালা সাথে নিলেন। যাতে খাওয়ার-দাওয়ার প্রয়োজন পেয়ালা দ্বারা সমাধা করা যায়। আর ঘুমের প্রয়োজন হলে মাটিতে বালিশ রেখে ঘুমানো যায়। কিছু দূর অগ্রসর হতেই তিনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি নদীর তীরে বসে হাত দ্বারা চুল্লু বানিয়ে পানি পান করছে। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) ভাবলেন আমিতো

অনর্থক পেয়ালা নিয়েছি, পানি পানের কাজটিতো হাত দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং তিনি পেয়ালা ফেলে দিলেন। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি মাথার নীচে হাত রেখে ঘুমুচ্ছে। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ) ভাবলেন, বালিশতো আমি অযথা সাথে নিয়েছি। বালিশতো আল্লাহ তা'আলা আমার সাথেই দিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারাই কাজ চলবে। সুতরাং সেটাও তিনি ফেলে দিলেন।

এ অবস্থা অনুকরণযোগ্য নয়

এ ঘটনায় কেউ কেউ এই ভুলের মাঝে পতিত হয়ে পড়ে যে, পেয়ালা রাখাও অপব্যয়। বালিশ রাখাও অপব্যয়। হযরত থানভী (রাহঃ)কে আল্লাহ তা'আলা উচ্চ মর্তবা প্রদান করুন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, নিজের অবস্থাকে হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের সাথে তুলনা করো না। এর এক কারণতো এই যে, হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের উপর যে অবস্থা প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল একটি বিশেষ অবস্থা। যা সকলের অনুকরণযোগ্য নয়। বিশেষ অবস্থা বলতে অর্থ হচ্ছে-মানুষের স্বভাবে কোন বিষয় এভাবে প্রাধান্য লাভ করা, যে বিষয়ে সে অপারগ হয়ে পড়ে। অপারগ হওয়ার কারণে সেটা অন্যের জন্য অনুকরণযোগ্য থাকে না। কাজেই হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের অবস্থা আমাদের জন্য অনুকরণযোগ্য নয়। নতুবা আমাদের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল হয়ে বসবে যে, ঘর-বাড়ী, বিবি-বাচ্চা, বালিশ-পেয়ালা সব পরিত্যাগ করো, নতুবা খোদাকে পাবে না। অথচ দ্বীনের দাবী এটা নয়। বরং এটা হচ্ছে একটা বিশেষ অবস্থা যা হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)-এর উপর প্রাধান্য পেয়েছিল।

আয় অনুপাতে ব্যয়

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে- প্রত্যেক্য ব্যক্তির প্রয়োজন তার আয় অনুপাতে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সুতরাং খরচের সীমাও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। এখন যে ব্যক্তি স্বল্প আয়ের মানুষ তার ব্যয়ও সে অনুপাতে হবে। আর যে ব্যক্তি অধিক আয়ের মানুষ, ব্যয়ের সীমাও হবে সে পরিমাণ। আর যে মধ্যম আয়ের মানুষ তার ব্যয়ও হবে মধ্যম। মোটকথা আয় অনুপাতে খরচ চালিয়ে যেতে হবে। এরূপ হলে চলবে না যে, স্বামী

বেচারার আয় অল্প আর এদিকে স্ত্রী ধনী বিত্তবানদের ঘরে যা দেখে সে অনুযায়ী তা আবদার করতে থাকে। এ ধরনের আবদার বৈধতার পর্যায়ে পড়ে না। তবে স্বামীর জন্য উচিত নিজের আয় অনুপাতে উদারতার সাথে খরচ করা এবং স্ত্রীর অধিকার আদায়ে কৃপণতা না করা।

আমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার কি?

عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله ماحق زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر الا فى البيت

(আবু দাউদঃ কিতাবুন নিকাহ-স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার অধ্যায়-হাদীস নং-২১৪২)

হযরত মু'য়াবিয়া বিন হাইদাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার রয়েছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা যখন আহার কর, তখন তাদেরকেও আহার করাও। তোমরা যখন পরিধান করো, তাদেরকেও পরিধান করাও। আর তাদের চেহারায় মেরো না। তাদেরকে মন্দ বলো না। تقبح এর অর্থ হচ্ছে মন্দ বলা, মনে কষ্ট লাগার মত কথা বলা। আর তাদেরকে ঘর ছেড়ে বের হতে দিও না।

তাদের বিছানা পৃথক করে দাও

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তাদের মাঝে নির্লজ্জ কোন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করলে প্রথমে বোঝাতে হবে। বোঝানোর পর যদি সে সংশোধন না হয় এবং ফিরে না আসে, তাহলে বিছানা পৃথক করে দাও।

উল্লেখিত হাদীসে বিছানা পরিত্যাগ করার ব্যাখ্যা এই করা হয়েছে যে; বিছানা পৃথক করার উদ্দেশ্য ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া নয়, বরং ঘরের ভিতরই অবস্থান করতে হবে। অবশ্য শাসনের নিয়তে এবং মানসিক চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কামরা পরিবর্তন করে ফেল এবং পৃথক অবস্থান করো।

এরূপ পৃথকতা জায়েয নয়

ওলামাগণ এই হাদীসে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এরূপ অবস্থায় বিছানাতো পৃথক করে দিবে ঠিকই কিন্তু একেবারে কথা-বার্তা বন্ধ করবে

না। এমন পৃথকতা কাম্য নয় যে, একেবারে সালাম-কালাম বন্ধ করে দিবে এবং সালামের জওয়াবও দিবে না কিংবা কোন প্রয়োজনে কথা বলার দরকার হলে তাও বলবে না। এরূপ পৃথকতা জায়েয নয়।

চার মাসের অধিক সফরে বের হলে স্ত্রীর অনুমতি

এই হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম এও লিখেছেন যে, পুরুষের জন্য চার মাসের অধিক সফরে যেতে হলে বা বাড়ী থেকে দূরে থাকতে হলে, তা স্ত্রীর অনুমতি এবং তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে জায়েয নেই। সুতরাং হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) তাঁর রাজত্বকালে এই হুকুম জারী করেছিলেন যে, যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের জন্য দেশের বাইরে থাকে, তারা চার মাসের অধিক বাইরে থাকবে না। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম লিখেন, যদি চার মাসের কম সফর হয়, তাহলে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি চার মাসের অধিক হয়, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। চাই সে সফর যতই বরকতপূর্ণ হোক না কেন। এমনকি হজ্জের সফরেও যদি চার মাসের কম সময়ে ফিরে আসা যায়, তাহলে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি নফল সওয়াবের আশায় সেখানে এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থান করে, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দাওয়াত তাবলীগ এবং জেহাদের সফরের ক্ষেত্রে একই হুকুম। সুতরাং এ সকল মোবারক সফরে যেখানে স্ত্রীর অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, যারা চাকুরীর জন্য এবং অর্থ ইনকামের জন্য দীর্ঘ সফর করে তাদের জন্য স্ত্রীর অনুমতি আরো অধিক আবশ্যক। যদি স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত চলে যায়, তাহলে এর দ্বারা স্ত্রীর অধিকার হরণ বলে সাব্যস্ত হবে ফলে গোনাহগার হবে।

শ্রেষ্ঠ মানুষ কে?

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخياركم خياركم لاهله (তিরমিযী, কিতাবুর রেযা, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার অধ্যায়, হাদীস নং-১১৬২)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিনদের মাঝে ঈমানের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক কামেল মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে আখলাকের দিক দিয়ে সকলের

চেয়ে শ্রেষ্ট। সুতরাং যার আখলাক বা স্বভাব যত উন্নত হবে, সে ততবেশী কামেল মুমিন হবে। কারণ কাম্বেল বা পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী হচ্ছে, অপর ভাইয়ের সাথে উত্তম আচরণ করা। আর তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

আজকের যুগের উত্তম আচরণ

আজকাল প্রত্যেক বস্তুর অর্থ পাল্টে গেছে। পরিবর্তন হয়ে গেছে সকল রুসম রেওয়াজ। হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তইয়ব সাহেব (রাহঃ) বলতেন, পূর্বের তুলনায় এ যুগের সকল কিছু উলট পালট হয়ে গেছে। এমনকি পূর্বকালে প্রদীপের নীচে থাকত অন্ধকার। আর এ যুগে বাল্বের উপর থাকে অন্ধকার। এরপর তিনি বলতেন, এখন প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ মূল্যায়ন নেই। সকল কিছুতেই যেন পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এমনকি আখলাকের মর্মও পাল্টে গেছে। আজকে বাহ্যিক কতিপয় ফর্মালিটির নাম আখলাক। যথা মুচকি হেসে মিলিত হওয়া। সাক্ষাতের সময় কতিপয় রুসমী বাক্য উচ্চারণ করা। যথা এরূপ বলে দেওয়া যে 'আপনার দেখা পেয়ে যারপরনেই খুশি লাগছে' কিংবা 'আপনাকে পেয়ে খুবই ভাল লাগছে' ইত্যাদি। মুখেতো এ সকল বাক্য আওড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু দিল-মনে হিংসা ও বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্জোলিত হচ্ছে, জমাটবাঁধা ঘৃণাগুলো ফুঁসছে। ব্যাস আজকে এরই নাম 'উত্তম আচরণ'। আজকে এটা যেন একটা বিদ্যায় পরিণত হয়েছে যে, অপরের সাথে কিভাবে আচরণ করলে সে আমার প্রেমিকে পরিণত হবে। এর উপর রীতিমত পুস্তক লেখা হচ্ছে। অন্যকে আকর্ষণ করার এবং অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টির করার যেন প্রতিযোগিতা চলছে এবং সকল শক্তি এর পিছনে ব্যয় হচ্ছে। আর এরই নাম আজকের উত্তম আখলাক।

খুব ভাল করে বুঝুন! সত্যিকার আখলাকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই যার আলোচনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে গেছেন। বর্তমানের এই ফর্মালিটি আখলাক নয়, বরং এসব লোক দেখানো ভাওতাবাজী এবং প্রদর্শনী। অপরকে আকর্ষণ করার এবং অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার বাহানা। এসবই যশ-খ্যাতি লাভের জন্যে। প্রসিদ্ধি লাভের জন্যে, যা মূলত: উত্তম আচরণের পর্যায়েতো পড়েই না বরং বদ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

'হুসনে আখলাক' বা সদ্ব্যবহার এটা অন্তরের একটি অবস্থার নাম

মূলত: উত্তম ব্যবহার এটি একটি অন্তরের অবস্থার নাম, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যার প্রকাশ ঘটে। তা হচ্ছে, অন্তর আল্লাহর সকল সৃষ্টজীবের জন্য মঙ্গলাকাঙ্খী হওয়া। তাদের প্রতি মহাব্বত হওয়া। চাই সে দুশমন কাফেরই হোক না কেন। সে আমার প্রভুর সৃষ্টি-এ কথা ভেবে তার প্রতি মহাব্বত রাখা। তার প্রতি আমার ভাল ধারণা রাখা উচিত, ভাল আচরণ করা উচিত। প্রথম দিল-মনে এরূপ জযবা সৃষ্টি হবে। অত:পর তা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হবে। যথা চেহারায় অকৃত্রিম মুচকি হাসি এল, যা অন্যকে আকর্ষণ করা বা প্রভাবিত করার জন্য হবে না, যা হবে অন্তর্নিহিত আকাঙ্খা এবং জয্বা প্রকাশের এক আবশ্যিক দাবী স্বরূপ। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনাকৃত আখলাক আর আজকের আখলাকের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

'উত্তম আখলাক' সৃষ্টির উপায়

উত্তম আখলাক তৈরী করতে হলে শুধু অধ্যয়ন করার দ্বারা যথেষ্ট হয় না এবং শুধু ওয়াজ শুনে নিলেও কাজ হয় না। এর জন্য কোন মুরব্বী বা সংশোধনকারীর সুহবত বা সাহচর্যে অবস্থান করার প্রয়োজন পড়ে। আত্মশুদ্ধি এবং পীর-মুররিদীর যে সিলসিলা বুযুর্গদের থেকে চলে আসছে, এর আসল মাকসাদ এটাই যে, মানুষের মাঝে অকৃত্রিম উত্তম আখলাক সৃষ্টি করা এবং বদ আখলাক দূর করে দেওয়া।

মোটকথা ঈমানের দিক থেকে কামেল বা পরিপূর্ণ মানব সেই, যার আখলাক উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে কামেল মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আমীন।

আল্লাহর বান্দীদের মেরো না

وعن اياس بن عبد الله بن ابى ذباب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضربوا امة الله، فجاء عمر

الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : ذئرن النساء على ازواجهن الخ

(আবু দাউদ, কিতাবুন নিকাহ্, স্ত্রীদের প্রহার অধ্যায়। হাদীস নং ২১৪৬)

হযরত ইয়াস বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে সম্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহর বান্দীদেরকে তোমরা প্রহার করো না। অর্থাৎ স্ত্রীদের প্রহার করা এটা ভাল নয়। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে প্রহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তো যারা সরাসরি রাসূলের পবিত্র যবান থেকে এই নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করেছেন, তাদের জন্য এ কাজ অকাট্য হারাম বলে বিবেচিত হয়ে গেছে। এখন তাদের জন্য কোন অবস্থায়ই প্রহার করা বৈধ হবে না।

হাদীসে যন্নী কিংবা কত'য়ী

এ কথাটুকু বঝে নিন! এক প্রকার হাদীস হচ্ছে, যা আমরা কিতাবে পড়ে থাকি অথবা মুখে মুখে শ্রবণ করে থাকি। যা দীর্ঘ সনদের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরূপ হাদীস হচ্ছে 'হাদীসে যন্নী'। কারণ সেগুলো যন্নী হিসেবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। কাজেই এরূপ হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব। না করলে গোনাহগার হব। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন, সেটা যননী নয়, কত'য়ী। সুতরাং এর অন্যথা করলে শুধু গোনাহগারই হবে না, বরং ঈমান চলে যাবে। কেননা সে সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে অস্বীকার করল। সুতরাং সে কাফের হয়ে যাবে।

সাহাবায়ে কেরামই এর উপযুক্ত ছিলেন

কখনও কখনও আমাদের মনে এরূপ নির্বোধ খেয়াল আসে যে, হায়! আমরাও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে সে যমানার বরকতসমূহ অর্জন করতে পারতাম। আরে ভাই! এটাতো আল্লাহর হেকমত। তিনি তার প্রজ্ঞার মাধ্যমেই আমাদেরকে এ যুগে পাঠিয়েছেন। নতুবা আল্লাহই জানেন আমরা সে যুগে পয়দা হলে কোন দলের পথিক হতাম। আল্লাহ রক্ষা করুন! কারণ সে যুগে ঈমানের বিষয়টি এতই কঠিন ছিল, সামান্য কারণে সব এদিক সেদিক হয়ে যেত।

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলের সাথে যে ধরনের আত্মত্যাগ এবং কুরবানী পেশ করেছেন, তা একমাত্র তাদের জন্য সম্ভব ছিল। আর এর ফলেই তাঁরা সে মর্তবায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের মত আরামপ্রিয় এবং বিলাসপ্রিয়রা যদি সে যুগে হতাম, তাহলে আল্লাহই ভাল জানেন কি হাশর হত।

কাজেই আল্লাহর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের এই পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং এমন যুগে প্রেরণ করেছেন, যে যুগে আমাদের জন্য অনেক সহজবোধ্যতা রয়েছে। আজ আমরা কোন এক হাদীসের ক্ষেত্রে বলে দেই যে, এটা যননী। আর যননী হওয়ার প্রেক্ষিতে কেউ একে অস্বীকার করে দিলে অন্তত: কাফের হবে না বা ঈমান চলে যাবে না। শুধু গোনাহগার হবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকে কোন নির্দেশ শোনার পর সেটা অস্বীকার করলে, সে কাফের হয়ে যেত। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

নারীরা বাঘে পরিণত হল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলে দিলেন, তোমরা স্ত্রীদেরকে প্রহার করো না, তখন প্রহার করার রীতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কারণ সাহাবায়ে কেরামতো এরূপ ছিলেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে কোন ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা শুনে আবার সেটা করবেন। স্ত্রীদেরকে প্রহার করার রীতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছু দিন পর হযরত ওমর ফারুক (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ

ذئرن النساء على ازواجهن

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনতো স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর বাঘে পরিণত হয়েছে। কেননা আপনি তাদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আপনার নিষেধাজ্ঞার পর কেউ স্বীয় স্ত্রীর উপর হাত তুলছে না। উপরন্তু প্রহারের নিকটবর্তী হতেও ভয় পাচ্ছে। আর এর ফলে স্ত্রীরা বাঘে পরিণত হয়েছে এবং স্বামীদের অধিকার ক্ষুন্ন করছে। স্বামীদের সাথে অন্যায় আচরণ করতে শুরু করেছে। সুতরাং এ অবস্থায় আমরা কি করব?

فرخص فى ضربهن

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়ে দিলেন যে, যদি স্ত্রীরা স্বামীদের অধিকার ক্ষুন্ন করে এবং প্রহার করা ব্যতীত আর কোন উপায় না থাকে, তাহলে প্রহার করারও অনুমতি রয়েছে।

এই অনুমতি প্রদানের ফলে কিছু দিন পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অনেক মহিলারা এসে আরয করতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি স্বামীদেরকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন, যার ফলে অনেক স্বামীরা অন্যায় ফায়দা লুটতেছে এবং আমাদেরকে এভাবে প্রহার করছে।

এরা ভাল মানুষ নয়

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اطاف بال

محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের নাম উল্লেখ করে বললেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘরে অনেক স্ত্রীরা আসা যাওয়া করে এবং তারা স্বীয় স্বামীদের অভিযোগ করে যে, স্বামীরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে। তাদেরকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে। সুতরাং খুব ভাল করে বুঝে নাও যে, যারা এরূপ মারপিট করে, তারা ভাল মানুষ নয় এবং মারপিট করা এটা মুমিন এবং মুসলমানের কাজ নয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসকল কথা দ্বারা এ বিষয়টি পরিস্কার বুঝা গেল, একান্ত অপারগতার ক্ষেত্রে যখন প্রহার ব্যতীত আর কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে, একমাত্র তখনই প্রহার করা বৈধ। আর প্রহারের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যেন শরীরে দাগ না পড়ে এবং অনেক বেশী কষ্টকর না হয়। কিন্তু তারপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের ইচ্ছা বা আসল সুন্নত হচ্ছে, পুরুষেরা স্ত্রীদের উপর হাত উঠাবে না।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণ তথা এ উম্মতের জননীগণ বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জীবনে কোন স্ত্রীর উপর হাত তুলেননি। অতএব তাঁর সুন্নতের দাবী এটাই।

পৃথিবীর সর্বোত্তম বস্তু 'পুণ্যবান নারী'

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৭)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল 'আছ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ পৃথিবীর সকল কিছুই মানুষের ভোগ্য-সামগ্রী। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল বস্তুর দ্বারাই মানুষ ফায়দা অর্জন করে, লাভবান হয়। কারণ পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের উপকারার্থেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। যথা পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

(সূরাহ বাকারাহ: আয়াত ২৯)

অর্থাৎ আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের ভোগের জন্য সৃজন করেছেন। আর এ পৃথিবীর সর্বোত্তম ভোগ্য-বস্তু হচ্ছে-পুন্যবান নারী। যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয় এবং লাভবান হয়।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

احب الى من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عينى

(কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ১৮৯১৩)

অর্থাৎ তোমাদের দুনিয়ার তিনটি বস্তু আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। 'তোমাদের দুনিয়া' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত চমৎকার শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা এ জন্য বলেছেন যে, অন্য এক স্থানে তিনি ইরশাদ করে এসেছেন ঃ

مالى وللدنيا ما انا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها

(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, হাদীস নং ২৩৭৮)

অর্থাৎ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমিতো এমন এক আরোহীর ন্যায়, যে আরোহী কোন বৃক্ষের ছায়ায় সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়।

অত:পর রওয়ানা হয়ে যায় এবং সে বৃক্ষের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করে। সুতরাং তিনি বলছিলেন যে, তোমাদের দুনিয়ার মধ্য থেকে তিনটি বস্তু আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। সে তিনটি বস্তু হচ্ছে এক-নারী। দুই-সুগন্ধি। তিন- নামায আমার চোখের শীতলতা।

মন্দ নারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে

মোটকথা তিনটি পছন্দনীয় বস্তুর মধ্যে একটি পুন্যপান নারী। কারণ নারী যদি পুণ্যবান না হয়, তাহলে এরূপ নারী থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় কামনা করেছেন ঃ

اللهم انى اعوذبك عن امراة تشيسنى قبل المشيب واعوذبك من ولد يكون وبالا

হে আল্লাহ! সে নারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৃদ্ধ করে দিবে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন সন্তান থেকে, যে আমার জন্য মসীবতের কারণ হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন। আমীন।

কাজেই যখন নিজের জন্য বা নিজের সন্তানের জন্য স্ত্রী সন্ধান করবে তখন এমন নারীন সন্ধান করবে, যার মাঝে দ্বীনদারী রয়েছে। আল্লাহ না করুন যদি তার মাঝে দ্বীনদারী না থাকে, তাহলে সে আল্লাহর আযাবের কারণ হয়ে দঁড়াবে।

আর কারো ভাগ্যে যদি দ্বীনদার এবং পুন্যবান স্ত্রী মিলে যায়, তার জন্য উচিত হবে স্ত্রীর যথাযথ মূল্যায়ন করা। তার অবমূল্যায়ন না করা। আর মূল্যায়ন তখনই করা হবে যখন তার অধিকারসমূহ যথাযথ আদায় করা হবে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বর্ণিত আয়াত এবং হাদীস সমূহের উপর আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

স্বামীর হক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْ..... اَمَّابَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.....حَفِظَ اللّٰهُ (سورة النساء ٣٤)

বিগত আলোচনায় স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে এই দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে, একজন স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত এমন একটি জীবন বিধান, যা শুধু একদিকের আলোচনা করেই শেষ করে দেয়নি, বরং উভয় দিককে বরাবর গুরুত্ব প্রদান করে এবং উভয়ের ইহ-পারলৌকিক মুক্তি ও সফলতার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। সুতরাং যেভাবে স্বামীর উপর স্ত্রীর হকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, অনুরূপ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় প্রকার হক আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালো তাকিদ প্রদান করেছেন।

সকলেই স্বীয় হক আদায়ে ব্যস্ত

ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপর অর্পিত ফরজসমূহ আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং নিজস্ব অধিকার আদায় করার ব্যাপারে তেমন জোর দেয়া হয়নি। কিন্তু আজকের পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে, সর্বত্র নিজের অধিকার আদায়ের শ্লোগান উচ্চকিত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সমধিক তৎপর। এ জন্যে চলছে আন্দোলন চলছে মিটিং-মিছিল, সেমিনার-সেম্পুজিয়াম। চলছে হরতাল, ধর্মঘট। চলছে প্রচারত্র বিলি সহ সকল প্রকার আয়োজন। নিজের অধিকার আদায় ও প্রাপ্তির জন্য দুনিয়াজোরা চেষ্টা-তদবীরের যেন শেষ নেই। এ জন্য রীতিমত গঠিত হচ্ছে দল সংগঠন ও ফোরাম। যথা-'অমুক সংগঠন' অমুক 'সংস্থা'। কিন্তু

ফরজ বা নিজের করনীয়টুকু আদায়ের জন্য কোন প্রকার তৎপরতা নেই, কোন সংগঠন নেই, নেই কোন সংস্থা। কেউ ভাবছে না যে, আমার উপর অর্পিত যে দায়িত্ব রয়েছে, তা আদায়ে আমি কতটুকু সচেষ্ট। কতটুকু আন্তরিক। শ্রমিক বলছে আমার অধিকার চাই। মালিক বলছে আমার কাজ চাই। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর কেউ ভাবছে না যে, আমার দায়িত্ব বা কর্তব্য আমি কতটুকু আদায় করছি।

পুরুষ বলছে আমার অধিকার চাই। নারীও বলছে আমার অধিকার চাই। আর এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা-কোশেশ এবং আন্দোলন চলছে। রীতিমত যুদ্ধ চলছে। কিন্তু কোন আল্লাহর বান্দা একটি বারের জন্যও এ কথা ভেবে দেখছে না যে, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্যটুকু আমি আদায় করছি কি না।

প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব যথাযথ আদায় করবে

আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার সারকথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। যদি প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে, তাহলে কারো অধিকার অপূর্ণ থাকবে না। মজদুর যদি তার দায়িত্ব যথাযথ আদায় করে, তাহলে বিত্তবান বা মালিক শ্রেণীর হক আদায় হয়ে গেল। মালিক শ্রেনী যদি তাদের কর্তব্য যথাযথ আদায় করে, তাহলে মজদুরদের হক আদায় হয়ে গেল। ঠিক এমনি করে স্বামী যদি তার দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপূর্ণরূপে আদায় করে, তাহলে স্ত্রীর অধিকার আদায় হয়ে যাবে। অপর দিকে স্ত্রীর যদি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করে, তাহলে স্বামীর হক আদায় হয়ে যাবে। শরীয়তের আসল দাবী এটাই যে, তোমরা যার যার দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ পালনে তৎপর হও।

প্রথম নিজকে নিয়ে ভাবতে হবে

আজকে আমাদের যুগে সকল কিছুতেই উল্টা স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। কেউ আত্মশুদ্ধির কেতন উড়ালে, তার কামনা থাকে, প্রথমে অন্যের দ্বারা এটা শুরু হোক। নিজের ব্যাপারে ভাবে না যে, প্রথম আমার থেকেই তার সূচনা হোক কারণ আমিওতো ভ্রান্তির মাঝে রয়েছি, বরং অন্যকে দিয়ে বওনি করাতে চায়। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (سورة المائده : ١٠٥)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজকে নিয়ে ভাব যে, তোমার উপর কি কি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। তোমার উপর আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের কি কি দাবী রয়েছে। সে সকল দাবীসমূহ আদায় করতে সচেষ্ট হও। অন্য কেউ ভ্রান্তিতে লিপ্ত থাকলে বা নিজের কর্তব্য পালনে তৎপর না হলে এর পরিণতি তোমার উপর বর্তাবে না। তবে শর্ত হচ্ছে তোমার দায়িত্ব তোমাকে যথাযথ আদায় করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার সারকথা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দেখুন! তাঁর যুগে লোকদের থেকে যাকাত উসূল করার জন্য 'আমেল'রা যেত। যারা লোকদের থেকে যাকাত উসূল করত। আর সে যুগে অধিকাংশ মানুষের সম্পদ হত চতুষ্পদ জন্তু। অর্থাৎ উট, বকরী, গরু প্রভৃতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত উসূল করতে যাওয়ার প্রাক্কালে 'আমেল'দেরকে একটি 'হেদায়েতনামা' প্রদান করতেন যে, তারা যাকাত উসূল করতে গিয়ে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে। সে হেদায়াতনামায় এটাও লেখা থাকত ঃ

لا جلب ولا جنب فى زكاة، ولا توخذ زكاتهم الا فى دورهم

(ابو داؤد، كتاب الزكاة، باب اين تصدق الاموال حديث نمبر ١٥٩١)

অর্থাৎ তোমরা স্বয়ং লোকদের বাড়ীতে গিয়ে যাকাত উসূল করবে। এরূপ করো না যে, তোমরা এক স্থানে বসে লোকেদেরকে যাকাত বহন করে নিয়ে আসার কষ্ট দিবে। এর পর তিনি এও বলেছেন যে ঃ

المعتدى فى الصدقة كمانعها

(ابو داؤد. كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث نمبر ١٥٨٥)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাকাত উসূল করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে অর্থাৎ পরিমাণের চেয়ে অধিক যাকাত উসূল করবে কিংবা অধিক ভাল বস্তুটা দেখে যাকাত উসূল করবে, তার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সে এ পরিমাণ গোনাহগার হবে যে পরিমাণ গোনাহগার হবে যাকাত আদায় না করলে। সুতরাং

একদিকে যাকাত উসূলকারীদেরকে বলা হচ্ছে তোমরা যাকাত আদায় করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে, তার চেয়ে এক তিল পরিমাণ বেশী উসূল করবে না। এরূপ করলে কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পাকরাও করা হবে। অপরদিকে যাকাত প্রদানকারীদেরকে এই নসীহত করা হচ্ছে ঃ

اذا جاءكم المصدق فلا يفارقنكم الا عن رضى

(ترمذى، كتاب الزكاة، باب ماجاء فى رضى المصدق. حديث نمبر ٦٤٧)

অর্থাৎ তোমাদের নিকট যাকাত উসূলকারীরা আগমন করবে। কখনো যেন তারা তোমাদের থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে না যায়। তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বিদায় দিবে। এরূপ কোন আচরণ করবে না, যার দ্বারা তারা অসন্তুষ্ট হয়। কারণ তারা মূলত: আমারই পাঠানো প্রতিনিধি। তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার অর্থ আমাকে অসন্তুষ্ট করা।

মোটকথা একদিকে যাকাত উসূলকারীদেরকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, অপরদিকে যাকাত প্রদানকারীদেরকে বলেছেন, উসূলকারীদের সাথে অসন্তোষজনক আচরণ না করতে। অর্থাৎ প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি যাকাত প্রদানকারীদেরকে বলেননি তোমরা সবাই দিলে আন্দোলন কর যাকাত উসূলকারীদের বিরুদ্ধে।

সুতরাং শরীয়তের মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথ আদায় করতে সচেষ্ট থাকবে। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং ভাবতে হবে যে, আমি আমার প্রভুর সম্মুখে ঠিক ঠিক জওয়াব প্রদান করতে পারব কি না? দ্বীন-ধর্মের মূল দর্শন এটাই। অপর ব্যক্তি তার দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ আদায় করছে কি না, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আমার নেই। কারণ সেটার জন্য আমি জিজ্ঞাসিত হব না।

জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দময় করার উপায়

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। প্রথম উভয়ের দায়িত্ব কর্তব্য বাতলে দিয়েছেন। স্বামীকে বলে দিয়েছেন, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই। স্ত্রীকে বলে দিয়েছেন, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এই। সুতরাং

প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথ আদায় করবে। আর জীবন নামের এই তরিটি এভাবেই চলবে। উভয়ই যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবে। অন্যের অধিকার যথাযথ আদায় করার চেষ্টা করবে। নিজের অধিকার আদায়ের চেয়ে অন্যের অধিকারকে অধিক প্রাধান্য দিবে। এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলে আশা করা যায় জীবন সুখ ও শান্তিময় হবে। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জীবন সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য এত অধিক পরিমাণ ফিকির করেছেন যে, কুরআন ও হাদীস এ সকল আলোচনায় ভরপুর। আর যদি উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তাহলে তা কত জঘন্য তা এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নিকট পৃথিবীর বুকে এত অপছন্দনীয় বস্তু আর কিছু নেই যে পরিমাণ অপছন্দনীয় স্বামীর স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া।

ইবলীসের দরবার

এক হাদীসে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবলীস শয়তান কখনো কখনো সমুদ্রে পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে এবং নিজের দরবার বসায়। এ সময় পৃথিবীর বুকে তার যত চেলা-চামুন্ড রয়েছে এবং যারা তার প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করছে, তারা সকলেই সে দরবারে উপস্থিত হয়। এমতাবস্থায় সকল চেলাদের কারগোজারী তলব করে বলা হয়, আজ তোমরা কে কি কাজ আঞ্জাম দিয়ে এসেছ বর্ণনা কর। এরই মধ্যে এক চেলা দাঁড়িয়ে বলে, এক ব্যক্তি নামায পড়ার ইচ্ছায় মসজিদের দিকে যাচ্ছিল। আমি পথিমধ্যে তাকে এমনকাজে ফাঁসিয়ে দিয়েছি যার ফলে তার নামায ছুটে গেছে। ইবলীস আনন্দিত হয়ে বলে তুমি ভাল কাজ করেছ। তবে সে খুব বেশী আনন্দ প্রকাশ করে না। দ্বিতীয় আরেক চেলা এসে বলে, জনাব অমুক ব্যক্তি অমুক ইবাদতের জন্য যাচ্ছিল, আমি তাকে ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রেখেছি। ইবলীস তাকেও বাহবা দিয়ে বলে, তুমিও ভাল কাজ করেছ।

এমনিভাবে প্রত্যেক চেলা যার যার কারগোজারী বর্ণনা করতে থাকে আর ইবলীস খুশি হয়ে শুনতে থাকে। এরই মধ্যে এক চেলা এসে বলে, এক এলাকায় স্বামী স্ত্রী দুই জন খুবই শান্তি-সুখের সাথে জীবন অতিবাহিত করছিল। প্রেম ভালবাসা কোন কিছুই তাদের মাঝে অভাব ছিল না। আমি

তাদের মাঝে এমন কান্ড ঘটিয়েছি যার ফলে তাদের সুখময় জীবনের অবসান ঘটেছে। অর্থাৎ এক পর্যায়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হয় এবং সে ঝগড়ার ফলে তাদের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইবলীস এ কথা শোনার সাথে সাথে তার সিংহাসন থেকে নেমে আসে এবং আনন্দের আতিশয্যে তার এই চেলাকে জড়িয়ে ধরে তার সাথে কোলাকুলি করে আর বাহবা দিয়ে বলে, আসলে তুমিই আমার প্রকৃত প্রতিনিধি। তুমি যে কাজ করেছ, এরূপ কাজ আর কেউ করতে সক্ষম হয়নি। (ছহীহ মুসলিম, ছিফাতুল মুনাফিকিন হাদীস নং ১৮১৩)

এর দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারেন স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক ঝগড়া এবং একে অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সম্পর্কচ্ছেদ এটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নিকট কত অপছন্দনীয়। অপরদিকে ইবলীস শয়তানের নিকট তা কত প্রিয়। এ জন্যেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল কুরআন এবং হাদীসে উভয়ের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সমূহ অত্যন্ত ব্যখ্যা সহকারে আলোকপাত করেছেন। যদি লোকেরা এর উপর আমল করে এবং নিজের জীবনকে সে অনুযায়ী গড়ে তোলে, তাহলে দুনিয়ার জীবনও শান্তিময় হবে পরকালীন জীবনও সফল ও সার্থক হবে।

পুরুষ নারী উপর কতৃত্বশীল

এ জন্যে ইমাম নববী (রাহঃ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম এনেছেন 'স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার' সম্পর্কে। আর এর আলোকে কুরআনী আয়াত এবং হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি যে আয়াতখানা এনেছেন তা হচ্ছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

(سورة النساء : ٣٤)

অর্থাৎ পুরুষ নারীর উপর কতৃত্বশীল বা পরিচালক। কেউ কেউ এই আয়াতের অর্থ এই লিখেছেন যে, পুরুষ নারীর হাকেম বা শাসক। قوام বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে কোন কাজ করার বা তার এন্তেজাম করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যেন পুরুষ নারীর দায়িত্বশীল। তার সকল কাজের পরিচালক।

এটি একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হল। কারণ যে কোন বিষয়ের উসূল বা মূলনীতি স্মরণে না থাকা অবস্থায় সে কাজ করতে গেলে ভুল করে বসাটাই স্বাভাবিক। সুতরাং নারী পুরুষের অধিকার সমূহ আলোচনা করতে গিয়ে

নারীকে সর্বপ্রথম উসূল বা মূলনীতি বলে দেওয়া হল এই যে, পুরুষ তোমার জীবনের সকল কাজের শাসক বা পরিচালক।

বর্তমান দুনিয়ার প্রোপাগান্ডা

বর্তমান দুনিয়ায় যেখানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের নামে নারী স্বাধীনতার আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ 'শরীয়ত পুরুষকে নারীর উপর কতৃত্ব প্রদান করে, শাসক-পরিচালক বানিয়েছে আর নারীকে পুরুষের অধিন করেছে' এ কথাটি বলতে সাহস পায় না বা লজ্জা অনুভব করে। বর্তমানে খুব জোরেশোরে এর প্রচারাভিযান চলছে যে, নারীর উপর পুরুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আর নারীকে পুরুষের শাসিত বানিয়ে তাদের হাতে বন্দি কয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে।

ভ্রমণ অবস্থায় একজনকে নেতা বানাবে

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে পুরুষ আর নারী এরা জীবন নামী তরির দু'টি অংশ। যিন্দেগীর সফর উভয়কে এক সাথে অতিক্রম করতে হবে। এখন এই সফরের শৃংখলা রক্ষার্থে আবশ্যিকভাবে দু' জনের একজনকে সফরের দায়িত্বশীল হতে হবে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিদের্শ প্রদান করেছেন যে, যখন দুই ব্যক্তি কোন সফরে বের হবে, সফর চাই সংক্ষিপ্ত হোক চাই দীর্ঘ হোক সে সফরে একজনকে আমীর বা নেতা বানিয়ে নিবে। নেতা নির্বাচন ব্যতীত সফর করা উচিত নয়। যাতে সফরের যাবতীয় কার্যক্রম এবং পলিসি সেই আমীর বা নেতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়। যদি নেতা নির্বাচন করা না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সে সফর হবে বিশৃংলাপূর্ণ। (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং ২৬০৮)

সুতরাং একটি সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত সফরে যেখানে নেতা নির্বাচন করে নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, জীবনের একটি দীর্ঘ সফর যেখানে অতিবাহিত করতে হবে, সেখানে একজনকে আমীর বা নেতা বানানোর গুরুত্ব কেন অনুধাবিত হবে না। যাতে জীবন চলার পথে বিশৃংখলার সম্মুখিন হতে না হয় বরং সুষ্ঠু ও শৃংখলার সাথে জীবন অতিবাহিত হয়।

জীবন চলার পথে কে হবে নেতা

এখন দু'টিই পথ। জীবনের এই ভ্রমণ পথে হয়ত পুরুষকে নেতা বানাতে হবে, না হয় নারীকে নেতা বানিয়ে পুরুষকে তার অধিন করে দিতে

হবে। এ দু'য়ের কোন বিকল্প নেই। এখন মানবীয় সৃষ্টিবৈশিষ্ট্য, স্বভাব, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতার বিচারে উপরন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায় এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে কঠিন ও বৃহত কাজ আঞ্জাম দেওয়ার যে যোগ্যতা পুরুষকে প্রদান করেছেন, তা নারীকে প্রদান করেননি। সুতরাং নেতৃত্ব ও পরিচালনার কাজ একমাত্র পুরুষের দ্বারাই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে নিজে নিজে ফায়সালা প্রদানের পরিবর্তে ঐ পবিত্র সত্তার উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। যিনি নারী পুরুষ উভয়কে সৃজন করেছেন এবং জীবন পথের এই দীর্ঘ ভ্রমণে তাদেরকে চালিত করেছেন। তিনিই বলে দিবেন কে নেতা হবে আর কে হবে অধিন। তাঁর ফায়সালা ব্যতীত আর কারো ফায়সালা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। চাই তা যতই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা সুশোভিত হোক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন, জীবন পথের এই ভ্রমণে পুরুষ হচ্ছে হাকেম বা শাসক এবং পরিচালক। যদি তোমরা এই ফায়সালাকে সঠিক বলে মেনে নাও, তাহলে কামিয়াবী আর সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে। আর যদি না মান বরং এর বিরোধিতায় লিপ্ত হও, বিদ্রোহ কর, তাহলে জেনে রাখ! তোমাদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পতিত হবে। আর হচ্ছেও তাই। যার ভয়াবহ পরিণতি অবলোকন করার জন্য আজকে বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামে আমীর বা নেতার অবস্থান

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা যে শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন, তা ভাল করে অনুধাবন করে নেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা এখানে 'আমীর' 'হাকেম' এবং 'বাদশাহ' শব্দ ব্যবহার করেননি, বরং قوام শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর قوام শব্দের অর্থ পূর্বেই বলেছি যে, কোন কাজের যিম্মাদার হওয়া। আর যিম্মাদারীর অর্থ হচ্ছে, সম্মিলিতভাবে জীবন অতিবাহিত করার পলিসি বা নীতি নির্ধারণ করা। অত:পর সেই পলিসি অনুযায়ী জীবন চালিত হবে। কিন্তু قوام অর্থ কোন অবস্থাতেই মনিব নয় যে স্ত্রী তার দাসী বা চাকরানী হয়ে থাকবে। বরং উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে আমীর, মামুর বা হাকেম মাহ্কুমের সম্পর্ক। আর ইসলামে নেতার অর্থ এই নয় যে, সিংহাসনে বসে শুধু হুকুম চালাবে, বরং ইসলামে নেতার অর্থ তাই, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন ঃ

سيد القوم خادمهم (كنز العمال حديث نمبر ١٧٥١٧)

জাতির সর্দার হচ্ছে তাদের সেবক।

নেতা হলে এরূপ হও

আমার সম্মানিত পিতা জনাব মুফতি মুহাম্মদ শফী' (রাহঃ) একটি ঘটনা শোনাতেন যে, একবার আমরা দেওবন্দ থেকে অন্য কোথাও সফরে যাচ্ছিলাম। আমাদের উস্তায দারুল উলূম দেওবন্দের 'শায়খুল আদব' নামে খ্যাত হযরত মাওলানা এ'জায আলী (রাহঃ)ও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা মাদ্রাসা থেকে রওয়ানা হয়ে ষ্টেশনে পৌঁছলাম। গাড়ী তখনো ষ্টেশনে পৌঁছায়নি। মাওলানা এ'জায আলী (রাহঃ) বললেন, হাদীস শরীফে এসেছে যখন তোমরা সফরে বের হবে, তখন কাউকে নিজেদের আমীর বা নেতা বানিয়ে নিবে। সুতরাং আমাদেরও এই সফরে একজনকে আমীর বা নেতা বানিয়ে নেওয়া উচিত। হযরত ওয়ালেদ সাহেব (রাহঃ) বলেন, যেহেতু আমরা ছিলাম শাগরেদ আর তিনি ছিলেন উস্তায তাই আমরা বললাম, হযরত! আমীর বানানোর কি প্রয়োজন? আমীরতো বানানোই রয়েছে। হযরত জিজ্ঞেস করলেন কে আমীর? আমরা বললাম কেন আপনি। কারণ আপনি উস্তায আর আমরা হচ্ছি শাগরেদ। হযরত মাওলানা বললেন, আচ্ছা! তোমরা আমাকে আমীর বানাতে চাও? আমরা আরয করলাম জি হাঁ। কারণ এখানে আপনি ব্যতীত আর কে আমীর হওয়ার যোগ্য। ঠিক আছে! তবে আমীরের হুকুম সর্বদা মেনে চলতে হবে। কারণ আমীর মানেই হচ্ছে তার আনুগত্য করা। আমরা বললাম আমীর যখন বানিয়েছি ইনশাআল্লাহ আনুগত্যও করব। তিনি বললেন ঠিক আছে আমি আমীর। তবে আমার নির্দেশ যেন মেনে চল। ইতিমধ্যে গাড়ী চলে এলে মাওলানা আমাদের সকল সাথীদের কিছু সামানপত্র মাথায় এবং কিছু হাতে নিয়ে চলতে শুরু করলেন। আমরা বললাম হযরত আপনি একি করছেন! আমাদেরকে বহন করতে দিন। হযরত বললেন, আমাকে যেহেতু আমীর বানিয়েছ এখন নির্দেশ মানতে হবে। সুতরাং এসব আমাকে বহন করতে দাও। সুতরাং তিনি সকল সামানপত্র বহন করে গাড়ীতে ওঠালেন। সমগ্র সফরে যখনই কোন পরিশ্রমের কাজ আসত তিনি স্বয়ং তা করতেন, কাউকে করতে দিতেন না। আমরা কিছু

বলতে গেলে তিনি বলতেন, দেখ! তোমরা আমাকে আমীর বানিয়েছ। আর আমীরের হুকুম মানতে হয়। সুতরাং হুকুম মান এবং এসব আমাকে বহন করতে দাও। সুতরাং তাঁকে আমীর বানিয়ে সেদিন আমরা এক মহা সংকটে পতিত হয়েছিলাম। মূলত: প্রকৃত আমীরের অবস্থা এটাই।

নেতা হবে সেই সেবা জানে যে

আজকে নেতা বা আমীরের কল্পনা করতে গেলেই ভেসে ওঠে রাজা-বাদশাহদের আকৃতি, যে নিজের প্রজাকূলদের সাথে কথা বলতেও দ্বিধান্বিত হয়। কিন্তু কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী নেতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সেবা করতে জানে। যে মানুষের খাদেম। আমীর বা নেতার অর্থ এই নয় যে, তাকে মানুষের রাজাধিরাজ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন নির্দ্বিধায় হুকুম চালাবে। আর অন্যরা তার অধিনে গোলাম হয়ে থাকবে, বরং আমীর বা নেতার অর্থ হচ্ছে তার রায় বা ফায়সালা অবশ্যই কার্যকরী হবে, সাথে সাথে সেটা তাদের সেবার জন্য হবে। তাদের শান্তি ও স্বস্তিজন্য হবে।

স্বামীর স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্বের

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন পুরুষদের এই আয়াতটি তো ভালই স্মরণ আছে الرجال قوامون على النساء অর্থাৎ পুরুষেরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল। এখন তারা বসে বসে নারীদের উপর হুকুম জারী করছে। আর ভাবছে তারা (নারীরাতো) সর্বাবস্থায় আমাদের অনুগত এবং ফরমাবরদার থাকবে। আর আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে গোলাম মনিবের সম্পর্ক। (আল্লাহ এরূপ চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করুন) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো একটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, সেটি তারা বে-মালুম ভুলে যায়। সেটি মনে থাকে না। সেটি হচ্ছে ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(আর তাঁর নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগীনিকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ঃ আয়াত ২১)

হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন নিশ্চয় পুরুষ নারীর শাসক বা পরিচালক। কিন্তু পাশাপাশি সে বন্ধুও। নীতিগতভাবে সে নেতা কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মনিব আর গোলামের সম্পর্ক নয়। আর এক বন্ধু অপর বন্ধুকে নেতা বানিয়ে নিল। সুতরাং স্বামী এ দৃষ্টিকোণ থেকে তো নেতা যে, সে জীবন গোজরানের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের ফায়সালা দানকারী। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সে স্ত্রীর সাথে এরূপ আচরণ করবে, যেরূপ আচরণ মনিব গোলামের সাথে করে থাকে। তবে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম-নীতি ও শিষ্টাচারের দাবী থাকে। আর সে সকল দাবীর ক্ষেত্রে মান-অভিমানের প্রসঙ্গও আসে, যা নেতা বা হাকেম হওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

এরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি কাম্য নয়

হযরত থানভী (রাহঃ) বলেন, আমাদের এখানে কোন কোন হযরত মনে করে থাকেন যে, আমরা যেহেতু পরিচালক বা শাসক সুতরাং আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এরূপ হওয়া উচিত যেন স্ত্রীরা আমাদের নাম শুনেই কাঁপতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে না পারে। আমার এক সহপাঠি ছিলেন, যিনি একবার খুব গর্বভরে আমার সাথে বলছিলেন যে, যখন আমি কয়েক মাস পর আমার বাড়ীতে যাই, তখন আমার বিবি-বাচ্ছারা সাহসই পায় না আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে এবং আমার সাথে কথা বলতে।

অত্যন্ত অহংকার করে তিনি কথাগুলো বললেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি যখন বাড়ীতে যান তখন কি আপনি হিংস্র প্রাণী কিংবা বাঘে পরিণত হয়ে যান? যার কারণে তাঁরা আপনার নিকট আসতে ভয় পায়? তিনি বললেন, না তা হবে কেন, বরং আমরাতো قوام সুতরাং আমাদের একটা প্রভাব থাকা উচিত নয় কি?

খুব ভাল করে বুঝে নিন! قوام হওয়ার অর্থ এই নয় যে, বিবি-বাচ্চারা নিকটে আসতে এবং কথা বলতেও ভয় পাবে, বরং তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে হাবে। আর বন্ধুত্বের সম্পর্কের ধরনটা কেমন হবে তা শুনুন!

রাসূলের সুন্নত দেখুন!

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে বললেন, কখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক আর কখন অসন্তুষ্ট থাক উভয়

অবস্থা আমি অনুধাবন করতে পারি। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে আপনি তা অনুধাবন করতে পারেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক, তখন 'মুহাম্মদ' (মুহাম্মদের প্রভুর কসম) শব্দ দ্বারা কসম খেয়ে থাক। আর যখন তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট থাক, তখন ইবরাহীমের প্রভু (ইবরাহীমের [আঃ] প্রভুর কসম) শব্দ দ্বারা কসম খেয়ে থাক। ঐ সময় তুমি আমার নাম ব্যবহার কর না, বরং ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম ব্যবহার করে থাক। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন ঃ

انى لا اهجر الا اسمك

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শুধু আপনার নাম পরিত্যাগ করি। নাম ব্যতীত আর কিছু পরিত্যাগ করি না। (ছহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং ২-৭৮)

এখন আপনারা ভেবে দেখুন! কে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)। আর কার প্রতি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন? হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। যার অর্থ হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)ও কখনো কখনো অভিমান করে এমন কথা বলে ফেলতেন, যার দ্বারা অনুমান করা যেত যে, তার মনেও বেদনা ও অসন্তুষ্টি রয়েছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে قوامیت এর পরিপন্থী মনে করেননি, বরং তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে বলে দিলেন যে, তোমার অসন্তুষ্টিও আমি অনুধাবন করতে পারি।

স্ত্রীর মান-অভিমানও সহ্য করতে হবে

ইফ্কের ঘটনায় যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর উপর অপবাদ লাগানো হল (আসতাগফিরুল্লাহ) এবং এই অপবাদের কারণে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) এক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন হলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও চিন্তিত ছিলেন যে, লোকেরা এ ধরনের কথা-বার্তা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর নিকট এসে বলে দিলেন ঃ

> 'দেখ হে আয়েশা! এ বিষয়ে তোমার এতটা পেরেশান হওয়ার কোন কারণ নেই। যদি তুমি নিরপরাধ হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতার কথা প্রকাশ করে দিবেন।

আর যদি আল্লাহ না করুন তোমার দ্বারা কোন ভুল বা অন্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা করে নাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকয়টি হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে অত্যন্ত ব্যথিত করল এই কারণে যে, তিনি ভাবলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিকে ইংগিত করলেন কেন যে, যদি নিরপরাধ হয়ে থাকি, তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা প্রকাশ করে দিবেন। আর কোন ভুল করে থাকলে তাওবা করে নাও। তাহলে বুঝা যাচ্ছে রাসূলের মনেও সামান্য সন্দেহের দোলা লেগেছে যে, আমার দ্বারা এরূপ ভুল হতেও পারে। সূতরাং হযরত আয়েশা (রাযিঃ) খুব কষ্ট পেলেন এবং অত্যন্ত ব্যথিত মনে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আর ঐ মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর পবিত্রতার স্বপক্ষে আয়াত অবতীর্ণ হল। সে সময় ঘরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। আয়াত শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাযিঃ) উভয় খুব খুশি হলেন এবং বললেন এখন ইনশাআল্লাহ এ সকল অপবাদ দূর হয়ে যাবে। তখন হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন, মা আয়েশা! সু-সংবাদ গ্রহণ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার স্বপক্ষে আয়াত নাযিল করেছেন। সুতরাং ওঠ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করো। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আয়াত নাযিলের কথা শুনেও বিছানায় শুয়ে রইলেন এবং বললেন, এটা আমার আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছেন, সুতরাং আমি আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না। কারণ আপনারাতো মনে মনে সন্দেহই করে নিয়েছিলেন যে, আমার দ্বারা ভুল হতেও পারে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরায়ে নূর হাদীস নং ৭৫০)

এখানে বাহ্যত: হযরত আয়েশা রাসূলের সম্মুখে আসতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে খারাপ মনে করেননি। কারণ এটা ছিল হযরত আয়েশার পক্ষ থেকে মান-অভিমানের একটা ব্যাপার।

এই মান-অভিমান মূলত: বন্ধুত্বের দাবী। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক শুধু শাসক আর শসিতের নয়, বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আর বন্ধুত্বের দাবী

হচ্ছে এ ধরনের মান-অভিমানও মাঝে মাঝে সহ্য করতে হবে। অবশ্য যেখানে একেবারে বাড়বাড়ি হয়েছে, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টি এবং গোস্বাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ ধরনের মান-অভিমান তিনি সহ্য করেছেন।

স্ত্রীর মনোতুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা সুন্নত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে বন্ধুত্বের হক এভাবে আদায় করেছেন যে, রাসূলের মত ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বদা মহান আল্লাহর সাথে ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের সাথে তাঁর উত্তম আচরণ এবং তাদের মনোতুষ্টির দৃষ্টান্ত এরূপ ছিল যে, রাতের বেলা শুয়ে হযরত আয়েশাকে এগার বিবির কিস্‌সা শোনাচ্ছেন, ইয়েমেনে এগার জন মহিলা ছিল। তারা পরস্পর ওয়াদা করল যে, তারা সকলেই একে অপরকে স্ব স্ব স্বামীর বাস্তব অবস্থা শোনাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই বর্ণনা করবে কার স্বামী কেমন। তাদের কি কি গুনাগুন রয়েছে। কি কি দোষ-ত্রুটি রয়েছে। প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর গুনাগুন অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় আলোচনা করল। আর এই কিসসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে শোনাচ্ছেন। (শামায়েলে তিরমিযী, হাদীসে উম্মে যেরা')

স্ত্রীর সাথে হাস্য-রসিকতা করাও সুন্নত

একদা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন এবং সে দিনটি ছিল হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর পালা। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হালুয়া পাকিয়ে হযরত সাওদার গৃহে নিয়ে এলেন এবং রাসূলের সম্মুখে রেখে দিলেন। হযরত সাওদা (রাযিঃ) সামনেই বসা ছিলেন। তাকেও বলা হল খাওয়ার জন্য। হযরত সাওদা (রাযিঃ) কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, ভাবলেন আজকে আমার পালার দিন এবং রাসূল আমার গৃহে অবস্থান করছেন, তা সত্ত্বেও আয়েশা কেন হালুয়া পাকিয়ে নিয়ে এল। সুতরাং তিনি বলে দিলেন আমি হালুয়া খাব না। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন খেতেই হবে, নতুবা আপনার মুখে হালুয়া মেখে দিব। হযরত সাওদা (রাযিঃ) বললেন, আমি খাব না। সুতরাং হযরত আয়েশা

(রাযিঃ) অল্প হালুয়া নিয়ে হযরত সাওদার মুখে মেখে দিলেন। এবার হযরত সাওদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ দায়ের করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়েশা আমার মুখে হালুয়া মেখে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

অর্থাৎ যদি কেউ তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তাহলে তুমিও তার সাথে সেরূপ আচরণ কর। সুতরাং আয়েশা তোমার মুখে হালুয়া মেখে দিয়ে থাকলে তুমিও তার মুখে মেখে দাও। এবার হযরত সাওদা (রাযিঃ) সামান্য হালুয়া নিয়ে হযরত আয়েশার (রাযিঃ) মুখে মেখে দিলেন। এবার উভয়ের চেহারা হালুয়া মাখা অবস্থায়। আর এ সবই হচ্ছে রাসূলের সম্মুখে।

ইতিমধ্যে দরজায় কারো কষাঘাত পড়ল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল হযরত ওমরে ফারূক (রাযিঃ) এসেছেন রাসূলের সাথে দেখা করতে। (সম্ভবত: তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি) হযরত ওমরের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদ্বয়কে বললেন, তোমরা জলদি মুখ পরিস্কার করে এসো। কারণ ওমর তাশরীফ আনছেন। সুতরাং তাঁরা উভয় তাড়াতাড়ি মুখ পরিস্কার করে ফেললেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ লিল হায়ছামী ৪র্থ খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা)

যে পবিত্র সত্তার সাথে সরাসরি আল্লাহ পাকের সম্পর্ক এবং যিনি সর্বদা মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনে লিপ্ত যাঁর নিকট অনবরত ওহী আসছে, এ নশ্বর পৃথিবীর বুকে যাঁর সমান মর্যাদায় কেউ পৌঁছতে সক্ষম নয়, তিনি কি না স্বীয় পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের মনোতুষ্টির প্রতি এ পরিমাণ লক্ষ্য রাখতেন।

নতুবা সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু পুরুষকে قوام তথা নেতা বানিয়েছেন, সেহেতু সিদ্ধান্ত তারটাই কার্যকরী হবে। তবে স্ত্রী রায় বা পরামর্শ অবশ্যই প্রদান করতে পারবে। আর আমরা পুরুষকে এই নির্দেশ প্রদান করে রেখেছি যেন যথাসম্ভব সে স্ত্রীদের মনোতুষ্টির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখে। কিন্তু সিদ্ধান্ত তারটাই বাস্তবায়িত হবে। অতএব এ বিষয়টি যদি মনে না থাকে এবং বেগম সাহেব চান যে, সকল ক্ষেত্রে আমার সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে এবং পুরুষ নয় বরং আমি নেতা বনে যাব, তাহলে এটা হবে প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ। শরীয়ত

বিরোধী পদক্ষেপ। জ্ঞান-বুদ্ধি বিবর্জিত অন্যায় হস্তক্ষেপ। যার ফলে সংসার নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পতিত হতে বাধ্য।

নারীর দায়িত্বসমূহ

আল্লামা নববী (রাহঃ) এর পরে বলেন ঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰه

তিনি বলেন পুন্যবান নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য কি। পূন্যবান নারীর দায়িত্ব হচ্ছে তারা قانتات অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যকারীনী। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর স্বামীর যে সকল হকসমূহ রেখেছেন তা তারা যথাযথ আদায় করে। স্বামীর অবর্তমানে স্বামীর ঘর-সংসার রক্ষণাবেক্ষণ করে। একে আল্লাহ তা'আলা নারীর আবশ্যিক গুণ ঘোষণা করেছেন এবং তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার গৃহ হেফাযত করে। গৃহ হেফাযত করার অর্থ হচ্ছে, প্রথমেই সে নিজের হেফাযত করবে। যে কোন অন্যায় অপকর্ম থেকে নিজেকে সংরক্ষণ করবে। এর পর স্বামীর ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির হেফাযত করবে। সুতরাং হাদীসে এসেছেঃ

المرأة راعية فى بيت زوجها

(صحيح بخارى كتاب الجمعة، باب الجمعة فى القرى والمدن رقم ٨٩٣)

অর্থাৎ নারী স্বীয় স্বামীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। অর্থাৎ স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাযতের যিম্মাদার স্ত্রী। যেমন আমি বলেছি অধিকাংশ অবস্থায় স্ত্রীর উপর খাবার তৈরী করা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু স্বামীর গৃহ সংরক্ষণ, ধন-সম্পদ হেফাযত যাতে স্বামীর কোন সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, পবিত্র কুরআন এই দায়িত্বের ভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করেছে।

রসহীন বিধি-বিধানের গন্ডিতে জীবন চলতে পারে না

'স্ত্রীর জন্য খাবার প্রস্তুত করা ওয়াজিব নয়' এই যে কথাটা আমি বললাম, এটা একটা নীতি বা বিধান। কিন্তু এরূপ রসহীন বিধানের আলোকে জীবন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে চলতে পারে না। কারণ যেমনিভাবে খাবার তৈরী করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়। তদ্রুপ স্ত্রী অসুস্থ হয়ে গেলে বিধান অনুযায়ী স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করা, তার চিকৎসার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার জন্য অর্থ যোগান দেয়া ইত্যাদিও স্বামীর জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়। তেমনিভাবে

স্বামীর জন্য আবশ্যক নয় স্ত্রীকে তার পিতা-মাতার সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া। আবশ্যক নয় স্বামীর জন্য স্ত্রীর মাতা-পিতা এলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো। বরং ফুকাহায়ে কেরাম এ পর্যন্ত লিখেছেন যে, সপ্তাহান্তে শুধু একবার স্ত্রীর বাবা-মা মেয়েকে দেখতে আসতে পারবে এবং কথা-বার্তা বলে হাল-পুরসি করে চলে যাবে। তাদেরকে ঘরে বসিয়ে দেখা-সাক্ষাত করানো স্বামীর জন্য আবশ্যক নয়। সুতরাং এভাবে রসহীন বিধি-বিধানের আলোকে জীবন গোজরান করতে গেলে উভয় সংসারের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্ন হতে বাধ্য। বরং সুখ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন গড়তে হলে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই আবশ্যিক বিধি-বিধান অতিক্রম করে সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। আর স্ত্রীদের জন্য অনুসরণ করতে হবে পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের আদর্শকে।

স্ত্রীদের অন্তরে স্বামীর সম্পদের দরদ থাকা আবশ্যক

হযরত থানভী (রাহঃ) স্বীয় মাওয়ায়েজে বলেন, স্ত্রীদের জন্য স্বামীর সম্পদের প্রতি দরদ থাকা এটা ফরজের অন্তর্ভুক্ত। স্বামীর সম্পদ যেন অপাত্রে বিনা প্রয়োজরে ব্যয় না হয় সেদিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অপচয় থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, স্বামীর অর্থ-সম্পদ যেভাবে মনে চায় খরচ করতে থাকলাম। অথবা গৃহকে সম্পূর্ণ চাকর-বাকরদের উপর ছেড়ে দিলাম আর তারা যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে থাকল। যদি কোন স্ত্রী এরূপ করে, তাহলে সে তার ফরজ কর্তব্যের বিপরীত কাজ করল।

এরূপ নারীর উপর ফেরেশতাদের অভিসম্পাত

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت هى تجئ لعنتا الملئكة حتى تصبح (صحيح بخارى، كتاب النكاح، حديث نمبر ٥١٩٣)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীকে (সহবাসের জন্য) বিছানায় আহবান করে, আর স্ত্রী তার আহবানে সাড়া না দেয় অথবা আচার আচরণে তার প্রতি অনিহা প্রকাশ করে যার ফলে স্বামী অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে

সমগ্র রাত্রি ফেরেশতাগণ উক্ত স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হোক। লা'নতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র রহমত সে অর্জন করতে পারবে না। কারণ নারীর এত এত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হল। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের উন্নতি হওয়া। আর এই সম্পর্কের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে স্বামীর স্বস্তি ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত হওয়া। কারণ বিয়ের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন। যাতে বিয়ের পর স্বামীর অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। এ জন্যে স্ত্রীর উচিত হচ্ছে স্বামীর এ দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। স্বামীর আহবানে সাড়া দিয়ে সর্বদা তার মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে অভিসম্পাতিত হতে হবে। অন্য একটি বর্ণনা এরূপ এসেছে ঃ

اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملئكة حتى تصبح

(প্রাগুক্ত ঃ হাদীস নং ৫১৯৪)

অর্থাৎ যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর বিছানা ছেড়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে তার উপর ফেরেশ্তারা সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।

ভেবে দেখুন! হাদীস শরীফে শুধু একটি ছোট্ট কথা বলা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে আর স্ত্রী তাতে অস্বীকার করে অথবা এমন কোন আচরণ করে যার দ্বারা স্বামীর বাসনা পূরণ না হয়, তাহলে সমগ্র রাত স্ত্রীর উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে। এমনিভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী যদি ঘরের বাইরে সময় কাটায়, তাহলে যতক্ষণ বাইরে অবস্থান করবে ততক্ষণ তার উপর ফেরেশ্তাদের অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকে। এ সকল বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করে দিয়েছেন, কারণ এ সকল বিষয় থেকেই ঝগড়া এবং বিচ্ছেদের উৎপত্তি হয়।

স্বামীর অনুমতি ও নফল রোযা

وعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تؤخذ فى بيته الا باذنه

(صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب لا تاذن المراة فى بيت زوجها، حديث نمبر ٥١٩٥)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন নারীর জন্য বৈধ নয় তার স্বামীর উপস্থিতিতে (নফল) রোযা রাখা, তবে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে। অর্থাৎ কোন নারীর জন্য তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা জায়েয নয়। নফল ইবাদতের অনেক অনেক ফযীলত হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তা পালন করতে পারবে না। কারণ হতে পারে রোযা রাখার ফলে দিনের বেলা স্বামীর কষ্টে হতে পারে। অবশ্য স্বামীর জন্য উচিত স্ত্রীকে নফল রোযা রাখাতে নিষেধ না করা, বরং অনুমতি দেওয়া। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে এ বিষয়ে ঝগড়া হয় যে, স্ত্রী বলে আমি রোযা রাখব, আর স্বামী বলে তোমাকে রোযা রাখার অনুমতি দিব না। সুতরাং ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়ে স্বামীর জন্য উচিত বিনা কারণে স্ত্রীকে রোযা রাখাতে বাধা প্রদান না করা। তবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর জন্য রোযা রাখা জায়েয নেই। স্বামী অনুমতি না দিলে স্ত্রী নফল রোযা পরিত্যাগ করবে। কারণ স্বামীর আনুগত্য অগ্রগণ্য।

স্বামীর আনুগত্য বনাম নফল ইবাদত

এর দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর আনুগত্যকে সকল নফল ইবাদতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং রোযা রেখে যে সওয়াব অর্জন করবে, স্বামীর আনুগত্য দ্বারা তার চেয়ে অধিক সওয়াব অর্জিত হবে। অতএব স্ত্রী এটা মনে করবে না যে, আমি রোযা থেকে বঞ্চিত হলাম। কারণ রোযা রাখার উদ্দেশ্যইতো হচ্ছে সওয়াব অর্জন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলতে চান আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ না স্বামী সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং যে সওয়াব রোযা রেখে অর্জিত হত, সেটা রোযা না রেখে পানাহার করার পরও অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ।

গৃহস্থালী কাজকর্মে সওয়াব

অনেক সময় আমরা মনে করি স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়াবী এক প্রকার ভোগ-বিলাস। এটা শুধু প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণের একটা ব্যাপার। এ ধারণা অমুলক, রবং এটাও একটা দ্বীনী ব্যাপার। কারণ স্ত্রী যদি এই নিয়ত করে যে আল্লাহ তা'আলা আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন,

যার উদ্দেশ্য স্বামীকে সন্তুষ্ট করা। আর স্বামীকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাহলে এ সকল কিছু পুণ্যে পরিণত হবে। গৃহস্থালীয় যত কাজ মহিলারা করে থাকে, আর এতে নিয়ত থাতে স্বামীর সন্তুষ্টি, তাহলে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত যত কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হবে, তা সবই আল্লাহর দরবারে ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। চাই তা খাদ্য তৈরী হোক, চাই ঘরের দেখাশোনার ব্যাপার হোক চাই সন্তানদের পরিচর্যার ব্যাপার হোক, চাই স্বামীর বাসনা পূরণ করা হোক। অথবা স্বামীর সাথে বসে খোশালাপ হোক। এ সকল ক্ষেত্রে সওয়াব লেখা হবে, তবে শর্ত একটাই আর তা হচ্ছে নিয়ত সঠিক হতে হবে।

যৌন চাহিদা পূরণের মাঝেও পুণ্য

এ বিষয়ের উপর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী স্ত্রী পরস্পর একে অপরের দ্বারা যে যৌন চাহিদা পূরণ করে, এর দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা সওয়াব প্রদান করবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাতো মানুষ নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য করে থাকে। এর উপর আবার কি সওয়াব প্রদান করা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কেউ প্রবৃত্তির কামনা অন্যায়ভাবে অবৈধ পথে পূরণ করে, তাহলে গোনাহ হত কি না? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, হ্যাঁ তখন অবশ্যই গোনাহ হত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেহেতু স্বামী স্ত্রী অবৈধ পথ পরিহার করে বৈধ পথে নিজের যৌন চাহিদা মিটাচ্ছে আর তা করছে একমাত্র আমার নির্দেশ পালনার্থে। তাই এর জন্যও তাকে সওয়াব প্রদান করা হবে। (মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫ম খন্ড, ৬৭-৬৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'আলার রহমতের দৃষ্টি

আরো একটি হাদীস, যা আমি সরাসরি কোন হাদীসের কিতাবে দেখিনি, তবে হযরত থানভী (রাহঃ)-এর মাওয়ায়েজে পড়েছি। হযরত থানভী (রাহঃ) যা একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে, স্বামী যদি বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করার পর স্ত্রীর দিকে মহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখে এবং স্ত্রীও স্বামীর

দিকে মহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা উভয়ের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক শুধুমাত্র পার্থিব ও জৈবিক চাহিদা মিটানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ সম্পর্ক পরকাল তথা জান্নাত ও জাহান্নামের পথ তৈরীরও ওসীলা।

কাযা রোযার ক্ষেত্রে স্বামীর ছাড় দেওয়া উচিত

তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রমজান মাসে বিভিন্ন অপারগতার কারণে যে সকল রোযা ছুটে যেত, আমি সে সকল রোযা সাধারণত: পরবর্তী শা'বান মাসে কাযা করতাম। এটা আমি এ জন্য করতাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে অধিকহারে রোযা রাখতেন। সুতরাং সে সময়ে আমিও রোযা রাখতাম, রাসূলও রোযা রাখতেন। এটা ঐ অবস্থা থেকে উত্তম যে, আমি রোযা রাখলাম, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাবিহীন। যদিও তা নফল রোযা ছিল না, বরং রমজানের কাযা রোযা ছিল। আর কাযা রোযার ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে তা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে নেওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাযিঃ) শুধুমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের প্রতি খেয়াল রেখে রমজানের কাযা রোযাকে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। (ছহীহ বুখারী, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং-১১৪৬৬)

ঘরে অন্যের প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি

উল্লেখিত হাদীসটির পরবর্তী অংশ হচ্ছে ঃ

ولا تأذن فى بيته الا بإذنه

অর্থাৎ স্ত্রীর দায়িত্ব এটাও যে, স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে প্রবেশ করতে দিবে না। অথবা এরূপ কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না যার উপর স্বামী অসন্তুষ্ট। এটা স্ত্রীর জন্য একেবারেই নাজায়েয বা হারাম। অন্য এক হাদীসে আরো বিস্তারিতভাবে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

الا ان لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فحقكم

عليهن ان لا يوطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون (ترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها، حديث نمبر ١١٦٣)

স্মরণ রেখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের কতিপয় হক রয়েছে আবার তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের কতিপয় হক রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের উপর উভয়ের কতিপয় অধিকার বা হক রয়েছে এবং এ সকল হকসমূহের প্রতি উভয় পক্ষের দৃষ্টি রাখা তা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। সে সকল হকসমূহ কি? তা হচ্ছে, হে পুরুষ সম্প্রদায়! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক হচ্ছে এই যে, তারা যেন তোমাদের বিছানা এরূপ ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর।

এখানে দু'টি হকের কথা বলা হচ্ছে। একটি হচ্ছে এই যে, স্ত্রীর উপর দায়িত্ব হচ্ছে সে স্বামীর গৃহে এমন কাউকে আসতে দিবে না, যার আসাটা স্বামী অপছন্দ করে। এমনকি যদি স্ত্রীর কোন নিকটাত্মীয়র প্রতি স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তাকেও স্বামীর গৃহে আসার অনুমতি স্ত্রী দিতে পারবে না আর পিতা-মাতা শুধু সপ্তাহান্তে একবার এসে স্বীর মেয়েকে দেখে যেতে পারবে। এতে স্বামী নিষেধ করতে পারবে না। কিন্তু তাদের জন্যও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অবস্থান করা জায়েয নেই। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, যাকে স্বামী অপছন্দ করে, তাকে তোমাদের গৃহে আসার অনুমতি দিবে না, চাই সে যে কেউ হোক না কেন।

আর দ্বিতীয় বাক্য বলেছেন এই যে, স্ত্রীরা যেন তোমাদের বিছানা এরূপ ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে না দেয়, যাকে তোমরা অপছন্দ কর। বিছানা ব্যবহার বলতে সবকিছুকেই বুঝায়। যথা বিছানায় বসা, বিছানায় শোয়া, ঘুমানো সবই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উম্মে হাবীবার ইসলাম গ্রহণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রাত্মা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)। সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটা ঘটনার মাঝে হেদায়েতের আলো। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হচ্ছেন আবু সুফিয়ানের মেয়ে। যিনি

দীর্ঘ ২১ টি বছর পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীব্র বিরোধিতা ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কাটান। কারণ তিনি ছিলেন মক্কান শীর্ষ নেতাদের একজন। সবশেষে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 'সাহাবী' খেতাব লাভ করে ধন্য হন। আর এটা ছিল মহান কুদরতের বহিঃপ্রকাশ যে, কাফেরদের এত বড় সর্দার হওয়া সত্ত্বেও তার মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন অনেক পূর্বেই। পিতা মুসলানদের চরম বিরোধিতা এবং শত্রুতায় লিপ্ত আর মেয়ে এবং জামাতা মুসলমান হয়ে গেছেন। এ ঘটনায় আবু সুফিয়ানের কলিজায় আঘাত পড়ে। মেয়ে জামাতা মুসলমান হওয়ার ঘটনা তিনি কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদানের চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে মক্কার মুসলমানরা কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে হাবশার দিকে হিজরত করছিলেন। সেই হিজরতকারীদের মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবা এবং তাঁর স্বামীও ছিলেন। তাঁরা হাবশায় গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল হয়ত ভিন্ন রকম। তাই হাবশায় বসবাসকালীন অবস্থায় তিনি একদা স্বপ্নে দেখলেন তাঁর স্বামীর আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি আশংকিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, আমার স্বামীর দ্বীন-ঈমান নষ্ট হয়ে যায় কি না। এর কিছু দিন পরই তাঁর এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। অর্থাৎ তাঁর স্বামী এক খৃষ্টানের নিকট যাতায়াত করত। এভাবে সেই খৃষ্টানের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে সে ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নেয়।

এ ঘটনায় হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) মনে ভীষণ আঘাত পান। কারণ যে ইসলামের জন্য মা বাবা পরিত্যাগ করে, দেশ ও আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, আর এই প্রবাস জীবনে একমাত্র সঙ্গী ছিল স্বামী, সেও আজ কাফের হয়ে গেল। সুতরাং তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। এর কিছু দিন পর তাঁর স্বামী ঐ অবস্থায় মারা গেল। এখন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হাবশায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। সুখ-দুঃখের খবর নেওয়ার মত তার কেউ রইল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে

এ দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় বসে জানতে পারলেন, উম্মে হাবীবার স্বামী খৃষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তিনি সেখানে নিঃসঙ্গ একাকী জীবন কাটাচ্ছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসীর নিকট সংবাদ পাঠালেন, যেহেতু উম্মে হাবীবা সেখানে একাকী অবস্থান করছে, সুতরাং তাকে আমার পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম দিন। অতএব বাদশাহ নাজ্জাসীর মাধ্যমে তাঁকে বিয়ের পয়গাম প্রদান করা হল।

হযরত উম্মে হাবীবা স্বয়ং রাসূলের সাথে তাঁর বিয়ের ঘটনা উল্লেখ করেন এভাবে যে, একদিন আমি স্বীয় ঘরে অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তিত অবস্থায় বসে ছিলাম। ইতিমধ্যে দরজায় কেউ আঘাত করল। দরজা খুলে দেখতে পেলাম একজন বাদী দাঁড়িয়ে আছে। উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোত্থেকে এসেছ? সে জবাব দিল হাবশার বাদশা নাজ্জাসী আমাকে পাঠিয়েছেন। (বাদশাহ নাজ্জাসী ইতিপূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনয়ন করেছিলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন পাঠিয়েছেন? সে জবাব দিল আমাকে এ জন্য পাঠানো হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন এবং বাদশাহ নাজ্জাসীর মাধ্যমে তা পাঠিয়েছেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বলেন, আমার কর্ণকুহুরে এই সংবাদ পৌঁছা মাত্র আনন্দের আতিশয্যে ঐ সময় আমার নিকট যা ছিল, তা আমি ঐ বাঁদীকে পুরস্কার হিসেবে প্রদান করে বললাম তুমি আমার জন্য এক মহা খুশির সংবাদ বহন করে এনেছ বিধায় তোমাকে পুরস্কৃত করলাম।

এরপর হযরত উম্মে হাবীবা হাবশা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় থাকাবস্থায়ই উভয়ের মাঝে বিয়ে সংঘটিত হয়ে যায়। এর কিছুদিন পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁকে মদীনার নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। (আল আসাবা ফী তমীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

একাধিক বিয়ের কারণ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক বিয়ে করেছেন। এ ব্যাপারে অজ্ঞ এবং মুর্খরা অনেক ধরনের মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু রাসূলের প্রতিটা বিয়ের পিছনে অত্যন্ত বড় ধরনের হেকমত কাজ করেছে। হযরত উম্মে হাবীবার বিয়ের প্রতিই লক্ষ্য করুন! হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) নিঃস্ব অসহায় অবস্থায় হাবশায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়ার মত কেউ ছিল না। এ অবস্থায় তিনি তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ না করলে কি অবস্থায় হত? সুতরাং এ অবস্থায় তাঁকে বিয়ে করে মদীনায় নিয়ে এলেন।

অমুসলিমের মুখে রাসূলের প্রশংসা

এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মু'জিযা। উম্মে হাবীবার সাথে রাসূলের বিয়ের সংবাদ আবু সুফিয়ান মক্কায় বসে জানতে পারে। তখনো তিনি রাসূলের চরম দুশমন এবং কাফের ছিলেন। নিজের মেয়ের বিয়ে রাসূলের সাথে সংঘটিত হওয়ার সংবাদ শোনামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁর মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বের হয়েছিল, তা ছিল এই যে, 'এটাতো চরম আনন্দের সংবাদ। কারণ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তো সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা যায় না। সুতরাং আমার মেয়ে উম্মে হাবীবার জন্য তার নিকটে যাওয়া এটা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

চুক্তি ভঙ্গ

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু সুফিয়ানের মাঝে যুদ্ধ বিরতির একটা চুক্তি হয়েছিল। সীরাতের গ্রন্থসমূহে যার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এক বছর পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এবং অন্যান্য কাফেররা সে চুক্তি মেনে চলে। কিন্তু এক বছর পর তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করে। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘোষণা করেন আমাদের জন্যও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক নয়। সুতরাং এখন আমরা যে কোন সময় ইচ্ছা করলে মক্কার উপর আক্রমন করতে পারব। কারণ দুশমনরা যেহেতু তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করছে না আমাদেরও

দায়িত্ব নয় তা রক্ষা করা। এই ঘোষণার পর আবু সুফিয়ান আশংকা করল যে কোন মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আক্রমন করে বসতে পারেন।

আপনি এই বিছানার উপযুক্ত নন

একবার আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমন করে বসল। হযরত আবু সুফিয়ান রাতের আঁধারে চুপে চুপে মদীনায় প্রবেশ করলেন। ভাবলেন আমার মেয়ে যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে রয়েছে, সুতরাং তাঁর সাথে কথা বললে হয়ত আমার রক্ষার একটা উপায় হতে পারে। সুতরাং তিনি চুপে চুপে উম্মে হাবীবার গৃহে উপস্থিত হলেন। মেয়ে পিতাকে অভ্যর্থনা জানালেন। হযরত উম্মে হাবীবার গৃহে তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা পাতা ছিল। হযরত আবু সুফিয়ান ঘরে ঢুকে রাসূলের বিছানায় বসতে চাইলেন। কিন্তু হযরত উম্মে হাবীবা ক্ষীপ্রতার সাথে রাসূলের বিছানা টেনে নিয়ে এক পাশে গুটিয়ে রাখলেন। আবু সুফিয়ান মেয়ের এই আচরণে অত্যন্ত বিহ্বল এবং বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

এই বিছানা কি আমার উপযুক্ত নয়?

নাকি আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই?

হযরত উম্মে হাবীবা জবাব দিলেন ঃ

আব্বাজান! আসলে আপনি এই বিছানার উপযুক্ত নন। কারণ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। একজন মুশরিককে আমি জীবনেও এই বিছানায় বসার অনুমতি দিতে পারি না।

এরপর (হযরত) আবু সুফিয়ান বলেন ঃ

আমার জানা ছিল না তুমি এতটা পরিবর্তন হয়ে যাবে যে, স্বীয় পিতাকে এই বিছানার বসার অনুমতি দিবে না।

এটা ছিল হযরত উম্মে হাবীবার ঐ হাদীসের উপর আমল যেঃ

لايوطئن فرشكم من تكرهون

'যাকে তোমরা অপছন্দ কর তাকে যেন তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের বিছানায় বসার অনুমতি না দেয়।' (আল ইসাবা ফী তমীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড ২৯৮)

স্ত্রী তৎক্ষণাত সাড়া দেবে

وعن طلق بن على رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأ ته وان كانت على التنور (ترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء فى حق الزوج على المرأة-حديث نمبر ١١٦٠)

হযরত ত্বল্‌ক বিন আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী স্ত্রীকে বিশেষ প্রয়োজনে (সহবাসের জন্য) আহবান করলে, স্ত্রীর উপর ওয়াজিব তৎক্ষণাত স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া, চাই সে চুলার নিকট থাকুক না কেন। অর্থাৎ যদিও স্ত্রী খাবার প্রস্তুতের কাজে লিপ্ত থাকুক তথাপি স্বামীর আহ্বানকে অবহেলা করতে পারবে না।

বিয়ে জৈবিক স্বস্তি অর্জনের বৈধ উপায়

এ সকল বিধি-বিধানের উদ্দেশ্য মূলত: এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে একটি জৈবিক কামনা রেখে দিয়েছেন। আর এই কামনা পূরণের জন্য এবং স্বস্তি অর্জনের জন্য একটি বৈধ উপায়ও রেখে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে বিয়ে। আর স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে এই প্রয়োজন পূরণই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্ববহ। কারণ এর দ্বারা বৈধতার সকল পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোন নারী পুরুষের মনে অবৈধভাবে এই চাহিদা পূরণের খাহেশ না জাগে। বরং স্বামী স্ত্রী দ্বারা এবং স্ত্রী স্বামী দ্বারা শান্তি ও স্বস্তি অর্জন করতে পারে। যেন পরপুরুষ বা পর নারীর প্রতি দৃষ্টি না যায়।

বিয়ের সহজবোধ্যতা

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বিয়ের এ সম্পর্কটাকে অতি সহজ করে দিয়েছেন। দুই জন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে ঈজাব কবূল করে নিলেই ব্যাস বিয়ে সংঘটিত হয়ে যায়। এমনকি বিয়ের খুতবাহ পাঠ করাও আবশ্যিক কোন বিষয় নয়। তবে খুতবাহ পাঠ করা সুন্নত। এমনিভাবে কোন কাযী ডেকে

বিয়ে পড়ানোও আবশ্যক নয়। অবশ্য কারো দ্বারা বিয়ে পড়ানো সুন্নত। কিন্তু এগুলো ব্যতীত যদি ছেলে এবং মেয়ে নিজেরাই স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঈজাব কবূল করে নেয় যথা একজন বলে আমি তোমাকে বিয়ে করলাম, দ্বিতীয় জন বলে আমি গ্রহণ করলাম। ব্যাস এটুকুর দ্বারাই বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের জন্য মসজিদে গমন করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই (স্বাক্ষী ব্যতীত) অন্য কোন মানুষের। যাতে বিয়ের প্রথাটি অতি সহজ থেকে সহজতর হয়ে যায়।

বরকতময় বিয়ে

অপরদিকে এই গুরুত্বারূপ করা হয়েছে যে, বিয়ের বিষয়টি অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বেশী জাঁকজমকতা ব্যতীত আঞ্জাম দেওয়া হয়। কোন ধরনের প্রথা কোন শর্তাদি এবং তেমন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। হাদীসে এসেছে, যখন সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তখন অভিভাবকগণকে তার বিয়ের কথা ভাববে। যেন তার অবৈধ পথে গমনের খাহেশ প্রয়োজন দেখা না দেয় এবং বৈধ পথ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُنَةً (مسند احمد ٦ : ٨٢)

সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হচ্ছে সে বিয়ে, যে বিয়েতে খরচ খুব কম করা হয়। বিয়ে যত বেশী ধুমধামের সাথে করা হবে ততবেশী তাতে বরকত কমে যাবে।

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের বিয়ে

হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ একজন জলীলুল কদর সাহাবী এবং তিনি 'বেহশতের সু-সংবাদপ্রাপ্ত দশজনে'র একজন। একদা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, তাঁর জামায় হলুদ রংগের দাগ লাগানো রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জামায় হলুদ রংগের দাগ কিসের? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের

সময় জামায় খুশবু লাগিয়েছিলাম, সেই খুশবুর দাগ এটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَعَلَيْكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

(صحيح بخارى، كتاب البيوع، باب "فاذا قضيت الصلاة فانتشروا" حديث نمبر-٢٠٤٨)

আল্লাহ তা'আলা তোমার এই বিয়েতে বরকত দান করুন। আর তুমি তোমার বিয়ের ওলীমা কর, চাই তা একটি বকরী দ্বারাই হোক না কেন।

হাদীসটিতে ভাবার বিষয় এই রয়েছে যে, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাযিঃ) আশারা মুবাশ্শারাগণের একজন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত নিকটতম একজন সাহাবী। কিন্তু তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু যে দাওয়াত করেননি, তা নয় বরং তাঁর বিয়ের কথা রাসূলকে জানাননি পর্যন্ত। বরং রাসূল তাঁর গায়ে রংগের দাগ দেখে জিজ্ঞেস করে তারপর জানতে পারলেন তাঁর বিয়ের সংবাদ। অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিয়ের কথা জানতে পেরে এই অভিযোগ করেননি যে, তুমি একাকী বিয়ের কাজ সেরে ফেললে, আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করলে না। কারণ শরীয়ত বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতাকে শর্তারোপ করেনি।

আজকে বিয়েকে জটিল করে ফেলা হয়েছে

হযরত জাবের (রাযিঃ) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মহিলার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। (ছহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ্, হদীস নং-৫০৭৯)

তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সাহাবী ছিলেন এবং সদা-সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অবস্থান করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিয়েতে রাসূলকে নিমন্ত্রণ করেননি। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় বিয়ের জন্য বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হত না, যার দ্বারা বুঝা যেত অমুকের বিয়ে হচ্ছে। মাসাধিকাল পূর্ব হতে এর কোন প্রস্তুতিও চলত না। পড়ত না

সমগ্র খান্দানে আনন্দ-উল্লাসের ধুম। শরীয়ত বিয়ের ব্যাপারটি যতবেশী সহজ করে দিয়েছে আমরা ততবেশী একে দুর্বোধ্য করে তুলেছি। যার ফলাফল হচ্ছে এই যে, অসংখ্য অগণিত নারী বিয়েহীন অবস্থায় আজ পিতা-মাতার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে আছে। কারণ অসহায় গরীব পিতামাতার পক্ষে মেয়ের বিয়ের যৌতুক যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছে না। কিংবা বিশাল আকারে আনুষ্ঠানিকতা করার অর্থ যোগান দিতে পারছে না। আর কোন প্রকারে সম্ভব হলেও হালাল হারাম সব এক করে ফেলা হচ্ছে।

এ সকল কু-প্রথা হিন্দু এবং খৃষ্টান সমাজ থেকে আমাদের সমাজে ঢুকে পড়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নতের যে সরল সহজ পথ আমাদেরকে বাতলে গেছেন, তা আমরা ভুলে গেছি। যার অশুভ পরিণতি আমরা তিলে তিলে অনুভব করছি। কারণ বিয়ে করে বৈধ উপায়ে নিজের যৌন চাহিদা মিটাতে গেলে কাড়ি কাড়ি টাকার প্রয়োজন। অজস্র ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। গাড়ী বাড়ীর মালিক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তা সম্ভব নয়। তাই এখন অবৈধ উপায়-উপকরণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন যেভাবে ইচ্ছা মনের খাহেশ মিটানো যাচ্ছে। অপরদিকে দিন রাত ঘরে টিভি ভিসিআর চলছে। চলছে যৌন সুঁরসুড়িমূলক অশ্লীল ফিল্ম। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে যৌন উন্মাদনা। আর দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বের হলেতো নিজের চোখকে হেফাযত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যার ফলে অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, আত্মমর্যাদাহীনতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতার অভিশাপ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং এ সকল কু-প্রথা আমাদের সমাজকে অধ:পতনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে।

যৌতুক এক সামাজিক আভিশাপ

আমাদের এই সমাজের নেতৃত্ব সমাজের বিত্তবান লোকদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে, যাদের ঘরে উন্নত খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, ব্যবস্থা রয়েছে ভোগ-বিলাসের। সুতরাং এই আযাব থেকে আমরা ততদিন মুক্তি পাব না, যতদিন সমাজের এই বিত্তবান শ্রেণী বিয়ে-শাদীর অনুষ্টানাদি সাদাসিধা ও অনাড়ম্বরভাবে পালন না করবে এবং এ সকল কু-প্রথা বর্জন না করবে।

কারণ সমাজের নিম্নবিত্ত বা গরীব শ্রেণীতো ভাবে যে আমাদের মান-সম্মান রক্ষার স্বার্থে এটা করতে হচ্ছে। এটা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নেই। কারণ মেয়েকে যদি যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেই, তাহলে তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তিরস্কার-ভর্ৎসনার ঝড় তুলে আমার চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লেগে যাবে। আর আমার মেয়ের উপর সংঘটিত হবে ছোটখাট একটা কিয়ামত। কারণ যৌতুক আজকে বিয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ঘর-গৃহস্থালীর সামানাদি যোগানোর দায়িত্ব ছিল স্বামীর উপর, এখন তা মেয়ের বাবার উপর ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। বাবা নিজের কলিজার টুকরা মেয়েকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিবে তার সাথে দিবে লক্ষ টাকার সম্পদ। ঘরের ফার্নিচার সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। অথচ শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। হ্যাঁ, কোন পিতা যদি তার মেয়েকে কিছু দিতে চায়, তাহলে তা সাদাসিধাভাবে যেটুকু সম্ভব দিবে। মোটকথা সমাজের বিত্তবানরা যে পর্যন্ত এ ভূমিকা পালন না করবে এবং এই হিন্দুয়ানী ও খৃষ্টানী প্রথা দূর করার জন্য জোরালো ভূমিকা পালন না করবে, সে পর্যন্ত এ সমাজ যৌতুক নামের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতে আমাদের মন-মানসে এই বিষয়টি বদ্ধমূল করে দিন। আমীন।

স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لو كنت آمراحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

(ترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء فى حق الزوج على المرأة، حديث نمبر ١١٥٩)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমার জন্য কাউকে এই নির্দেশ প্রদান করা বৈধ হত যে, অন্যকে সেজদা করো, তাহলে আমি স্ত্রীদেরকে নির্দেশ প্রদান করতাম তাদের স্বামীকে সেজদা করার জন্য। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয নেই, তাই আমি তাদেরকে এই

সেজদা করার নির্দেশ দিতে পারছি না। তবে দুনিয়াতে যদি কাউকে সেজদা করা বৈধ হত, তাহলে স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হত।

দু'টি মনের বন্ধন

জীবনের এই সফরে যেখানে একটি নারী একটি পুরুষ জীবন গোজরান করছে, সেখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে 'আমীর' বা ক্ষমতাবান এবং তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন। এই ক্ষমতা ব্যতীত আর যত ক্ষমতা রয়েছে, তা সবই ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর। আজকে এক ব্যক্তি নেতা বা শাসক হচ্ছে। কিংবা রাজা-বাদশাহ হচ্ছে। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব বা বাদশাহী অস্থায়ী বা নির্দিষ্ট দিন ও নির্দষ্ট সময়ের জন্য। গতকাল যে বাদশাহ ছিল আজ সে জেলের অন্ধকার প্রকোষ্টে মানবেতর জীনব যাপন করছে। কাল যে শাসক ছিল, আজ তার দু' পয়সার মূল্য নেই। সুতরাং এই নেতৃত্ব বা বাদশাহীতে উত্থান-পতন আছেই। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক চিরদিনের। স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতিক্ষণ ও প্রতি মুহূর্তের বন্ধু ও সাথী। সুতরাং এই সম্পর্কের কারণে স্বামীর যে ক্ষমতা অর্জিত হয়, তা জীবনের সর্বশেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কিংবা স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অটুট থাকা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। এ ক্ষমতা অন্য সকল ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজা প্রজার মাঝে শাসক শাসিতের মাঝে এক ধরনের বিধিবদ্ধ ও নিয়ম-নীতির সম্পর্ক থাকে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মাঝে শুধু কতিপয় নিয়ম-নীতি ও প্রথাগত সম্পর্ক নয়, বরং এখানে রয়েছে হৃদয়-মনের বন্ধন, অন্তরের টান। যার ব্যাপ্তি সমগ্র জীবন জুড়ে। এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ প্রদান করতাম স্বামীকে সেজদা করতে। কেননা সে জীবনব্যাপী সফরের আমীর বা নেতা।

সবচেয়ে অধিক ভালবাসার পাত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হচ্ছে-প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ফরজ-কর্তব্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। যখন তিনি স্বামীকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন, তখন তাঁর সকল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্ত্রীর অধিকার

সম্পর্কিত যে, স্ত্রীদের অমুক হক অমুক অধিকার। এরপর যখন স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করেছেন, তখন স্ত্রীদের এই দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন যে, তোমাদের এটা ভাবা উচিত, এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পর তোমাদের নিকট অধিক সম্মানের এবং ভালবাসার পাত্র হচ্ছে তোমাদের স্বামী। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম না হবে, ততক্ষণ স্বামীর অধিকার সঠিকভাবে আদায়ে তৎপর হতে সক্ষম হবে না। অবশ্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অধিকার সকলের উর্দ্ধে। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ এসে গেলে সেখানে পিতা-মাতা ও স্বামী কারো আনুগত্য চলবে না। কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পর সর্বাধিক মর্যাদা স্বামীর। সুতরাং তাকে সন্তুষ্ট রাখা, তার অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তার আনুগত্য করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নতুন সমাজের সকল কিছুতেই উল্টা স্রোত

আজকে সমাজের সকল কিছুতেই উল্টা স্রোত প্রবাহিত। হযরত কারী মুহাম্মদ তাইয়েব সাহেব (রাহঃ) বলতেন, আজকের সমাজের সকল কিছুতে উল্টা স্রোতের হাওয়া লেগেছে। এমনকি প্রথম যুগে বাতির নীচে অন্ধকার থাকত। আর এখন বাল্বের উপরে অন্ধকার থাকে। ঘর-গৃহস্থালীর কাজ যদিও স্ত্রীর উপর ওয়াজিব নয়, তথাপি নবীতনয়া হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)-এর সুন্নত এটা। কারণ হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ঘরের সকল কাজ নিজ হাতে করতেন। আর অপর দিকে স্ত্রীকে স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এখন যদি কোন নারী ঘর-গৃহের কাজ নিজ হাতে করে এবং স্বামী-সন্তানদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে, তাহলে এ জন্য তাকে উন্নতর প্রতিদান দেওয়া হবে এবং সে অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে।

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হচ্ছে আজকের উল্টা যুগের সিদ্ধান্ত হল-নারীদের জন্য ঘরে অবস্থান করা এবং ঘরের কাজ-কর্ম করা এটা পশ্চাদপদতা, বর্বরতা এবং আদিমতা। এর দ্বারা নারী চার দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই নারী যদি বিমানবালা হয়ে চার শত মানুষকে আহার করায়, তার সম্মুখে ট্রে সাজিয়ে রাখে এবং চার শত মানুষের আট শত লোলুপ দৃষ্টির

শিকার হয়, তাহলে এটা দোষের কিছু নয়। তার দ্বারা একেক জন একেক ধরনের সেবা গ্রহণ করে। কখনো বেল টিপে কাছে ডাকে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকেই। অথবা পিছনের গদিটা ঠিক করে দিতে বলে। এরই নাম আজকের নারী স্বাধীনতা। আর সেই নারীই যদি ঘরে অবস্থান করে নিজের স্বামী-সন্তান এবং ভাই-বোনের সেবা করে, তাহলে এর নাম কুসংস্কার এবং বর্বরতা (!)।

সেই নারী যদি কোন হোটেলে বেয়ারার কাজ করে এবং দিবারাত্র লোকদের সেবা করে, খাদ্য পরিবেশন করে, তাহলে এটা নারী স্বাধীনতার একটি অংশ। অথবা সে যদি কোন পুরুষের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে কাজ করে, তাহলে এর নাম স্বাধীনতা। আর যদি সে স্বামী সংসার সন্তানাদি নিয়ে ঘরে অবস্থান করে, তাহলে তার নাম পশ্চাদপদতা।

নারীর দায়িত্ব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর কারো সেবা করা নারীর উপর ওয়াজিব নয়। নেই তার উপর কারো যিম্মাদারী কিংবা কোন দায়িত্বের বোঝা। তারা সকল দায়িত্ব এবং যিম্মাদারী থেকে স্বাধীন। তবে একটি মাত্র দায়িত্ব তাদের রয়েছে, তা হচ্ছে তারা নিজ গৃহে অবস্থান করে স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করবে এবং ছেলে-সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। এটাই তাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য। এর দ্বারা তারা জাতির ভিত্তি স্থাপন করবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই সম্মানজনক মর্যাদা প্রদান করেছেন। এখন তাদের মধ্যে যার ইচ্ছা এই মর্যাদাকর অবস্থান গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা অপদস্থতার পথ গ্রহণ করবে।

সে নারী সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে

وعن ام سلمة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (ترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء فى حق الزوج على المرأة حديث نمبر ١١٦١)

হযরত উম্মে সালিমা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নারী মৃত্যুবরণ করবে এই অবস্থায় যে, তার উপর তার স্বামী সন্তুষ্ট ছিল, তাহলে সে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সে তোমাদের নিকট কয়েক দিনের মেহমান

عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه: عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لاتوئذى امرأة زوجها فى الدنيا الا قالت زوجة من الحور العين لا تئوذية قاتلك الله! فانما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك الينا (ترمذى، كتاب الرضاع، باب نمبر ١٩ حديث نمبر ١١٧٤)

হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট প্রদান করে, (কারণ অধিকাংশ স্ত্রীর মেজাযে ধৈর্য-সহ্যের বেশ অভাব থাকে, ফলে তারা হয় ঝগড়াপ্রিয়। ফলে স্বামীকে তারা কষ্ট দিয়ে থাকে) তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুরের আকৃতিতে জান্নাতে যে স্ত্রী প্রদান করবেন, জান্নাতের সে সকল হুরগণ দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে ঃ

> 'তুমি তাকে কষ্ট দিও না। কারণ সে তোমাদের নিকট কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। খুব শীঘ্রই সে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার নিকট চলে আসবে।'

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝগড়াটে নারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, এর দ্বারা তাদের কিছু হবে না, কারণ দুনিয়াতে তাকে কষ্ট দিলে কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন 'হুরে ঈনে'র সাথে সম্পর্ক করে দিবেন, যাঁরা তাঁদের স্বামীদেরকে এতটা ভালবাসে যে, তাদের মনে এখন থেকেই তাঁদের স্বামীদের জন্য কষ্ট পৌঁছে, যদি দুনিয়ার স্ত্রীরা তাদেরকে কষ্ট দেয়।

পুরুষদের জন্য কঠিন পরীক্ষা

وعن اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله

عليه وسلم قال: ماتركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء (صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب مايتقى من شوم المرأة حديث نمبر ٥٠٩٦)

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক কোন ফেতনা ছেড়ে আসিনি। নারীর ফেতনা পুরুষের জন্য সবচেয়ে কঠিন ফেতনা। এই হাদীসের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তক রচিত হয়ে যাবে যে, পুরুষের জন্য নারী কিভাবে ফেতনা স্বরূপ।

নারী পুরুষের জন্য কিভাবে ফেতনা

ফেতনার অর্থ পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জন্য এ দুনিয়াতে পরীক্ষা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এখন নারী পুরুষের জন্য কিভাবে পরীক্ষা এটা একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একত্রিত করা সম্ভব নয়। তবে এই পরীক্ষার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জন্য নারী পরীক্ষা হয়ে দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা নারীর প্রতি একটা আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন। এখন সেটা বৈধ পথেও হতে পারে আবার অবৈধ পথেও হতে পারে। এখন পুরুষ হালাল পথ অবলম্বন করে, নাকি হারাম পথ গ্রহণ করে–এটাই তার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আরেক পরীক্ষা এভাবে যে, যে স্ত্রী তার জন্য হালাল তার সাথে সে কিরূপ আচরণ করে। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল যেভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন, সেভাবে আচরণ করে, নাকি তার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার অধিকার ক্ষুন্ন করে।

তার দ্বারা তৃতীয় পরীক্ষা এই যে, স্ত্রীর প্রেম মুহাম্মদ এবং তার অধিকারসমূহ আদায় করতে গিয়ে এরূপ বাড়াবাড়ি করে ফেলা, যার দ্বারা দ্বীন-ধর্ম পশ্চাদে পড়ে যায়। স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্য তার সাথে ভাল আচরণতো করা হয় ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি তার না জায়েয আবদারও রক্ষা করা হয়ে থাকে এবং তাকে দ্বীনের সঠিক তরবিয়ত দেওয়া হয় না। এটাও

একটা পরীক্ষা। কারণ পুরুষকে দুই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিকে ভালবাসার দাবী যে, স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। অপরদিকে দ্বীনের দাবী হচ্ছে এই যে, শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাকে শাসন করতে হবে। মোটকথা পরীক্ষার কোন শেষ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকেই কেবল মানুষ এ সকল পরীক্ষাসমূহকে জয় করতে সক্ষম হয়। এক দিকে তারা স্ত্রীদের অধিকারসমূহ আদায় করবে, অপরদিকে তাদের দ্বীনী তা'লীম-তরবিয়তের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দোআ শিক্ষা দিয়েছেন যা তাঁর দোআয়ে মাছুরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তা এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبك من فِتنة النِساء

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট নারীর ফেতনা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হচ্ছে যে, এই ফিতনা থেকে বাঁচা এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিটা মানুষের জন্য আল্লাহর দিকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করা উচিত।

প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (صحيح بخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة فى القرى والمدن، حديث نمبر ٨٩٣)

এটি একটি আশ্চর্যজনক হাদীস এবং আমাদের মধ্যে সকলেই এই হাদীসের সম্বোধিত ব্যক্তি। সুতরাং বলা হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তোমাদের অধিনস্ত বস্তু এবং ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অর্থাৎ তোমাদের যাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, সে দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। راعى বলা হয়, রক্ষক বা 'রাখাল'কে। কারণ সে মেষ বা বকরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। راعى -এর আরেক অর্থ শাসকও। আর শাসকের অধিনে যারা তারা হচ্ছে 'রইয়্যাত' বা

প্রজা। কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সকলেই শাসক সুতরাং প্রত্যেকেই তোমরা যার যার 'রইয়্যাত' বা অধিনস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ তোমরা কিভাবে কতটুকু করেছ, তার জবাব দিতে হবে।

নেতা তার অধিনস্তদের রক্ষক

والامير راع

প্রত্যেক নেতা তার অধিনস্তদের রক্ষক এবং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তোমরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করেছ? ইসলামে নেতার বৈশিষ্ট্য এই নয় যে, নেতা মাথায় মুকুট পড়ে জনগণ থেকে পৃথক হয়ে বসে থাকবে। বরং নেতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে একজন রাখাল। এ জন্যেই হযরত ওমর (রাযিঃ) বলতেন সুদূর ফোরাতের তীরেও যদি একটি কুকুর অনাহারে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আমার ভয় হয় যে, কেয়ামতের দিন আমাকে এ জন্য জিজ্ঞেস করা হবে যে, হে ওমর! তোমাদের শাসনকালে একটি কুকুর অনাহারে মারা গিয়েছিল কেন?

খেলাফত একটি বিরাট বোঝা

হযরত ওমর ফারূক (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের পূর্বক্ষণে তিনি যখন আহত অবস্থায় তখন লোকেরা বলেছিল, আপনি আপনার পর কাউকে খলীফা নির্বাচন করে যান। এমনকি লোকেরা তাঁর সম্মুখে তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর নিঃসন্দেহে একজন জলীলুল কদর সাহাবী। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া-পরহেযগারী, এখলাস কোন কিছুতেই কমতি ছিল না। লোকেরা তাঁর নাম উল্লেখ করলে পিতা হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন, তোমরা কি আমাকে খলীফা হিসেবে এমন ব্যক্তির নাম ঘোষণা করতে বলছ, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান পর্যন্ত যার জানা নেই?

ঘটনা হচ্ছে-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই তাঁর স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক

দিয়েছিলেন। অথচ ঋতু চলাকালীন অবস্থায় তালাক প্রদান করা নাজায়েয। অবশ্য তখন তাঁর এই মাসআলা জানা ছিল না। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা রুজু করতে বলেছিলেন। সুতরাং তিনি তালাক রুজু করেছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) এই ঘটনার দিকে ইংগিত করে বললেন, তোমরা এরূপ ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করতে বলছ, যে তালাক দেওয়ার বিধান পর্যন্ত জানে না।

তারপরও লোকেরা পিড়াপিড় করল এবং বলল, হযরত! এটা ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। মাসআলা না জানার ফলে তাঁর দ্বারা এমনটি হয়ে গেছে। সুতরাং তাই বলে তো সে খেলাফতের অযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। সুতরাং তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব প্রদান করে যান। এর জবাবে হযরত ফারূকে আজম (রাযিঃ) যা বলে গেছেন, তা স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বললেন, আসল কথা হচ্ছে, খেলাফতের 'ফান্দে' খাত্তাবের সন্তানদের একজনের গলায় পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট। আমার বংশের আর কারো গলে এই ফান্দ লাগাতে চাই না। কারণ নেতৃত্ব এবং খেলাফত একটি অনেক বড় বোঝা। পরকালে আমলনামার হিসাব-কিতাব দিতে যদি কোন রকম বরাবর থাকতে পারি, তাহলেই গনীমত মনে করব। এই হল নেতৃত্বের মূল কথা এবং দায়িত্বশীল হওয়ার সারমর্ম সুতরাং সে এই পদের হক কিভাবে আদায় করবে? এর পরের বাক্য হচ্ছে ঃ

পুরুষ স্ত্রী এবং সন্তানের রক্ষক

والرجل راع على اهل بيته

অর্থাৎ পুরুষ তার গৃহবাসী সকলের যিম্মাদার। স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি সকলেই 'গৃহবাসীর' অন্তর্ভুক্ত। পরিবারের যাদের সে প্রধান, সকলেই এর মাঝে চলে এসেছে। প্রত্যেক পুরুষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে তার ঘরের সদস্যদের ব্যাপারে। স্ত্রী সন্তানদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে। তাদেরকে কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। তাদের অধিকারসমূহ কতটুকু আদায় করা হয়েছে। তারা দ্বীন-ধর্মের উপর চলছে কি না সে ব্যাপারে কতটুকু খবরদারী করা হয়েছে। তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করা

হয়েছে নাকি জাহান্নামের পথিক বানানো হয়েছে। কিয়ামতের কঠিন দিবসে এ সকল বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যথা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (سورة التحريم :٦)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরাও জাহান্নামের অগ্নি থেকে বাঁচ এবং তোমাদের পরিবারস্থ লোকদেরকেও বাঁচাও।

নিজে তো খুব নামায আদায় করছ, যাকাত প্রদান করছ, ফরজ-ওয়াজিব, তাসবীহ-তাহ্লীল ইত্যাদি সকল কিছু আদায় করছ, কিন্তু নিজের সন্তান ভ্রান্ত পথের পথিক হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোন খবর নেই, তাহলে স্মরণ রেখো! কিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহ্র নিকট এর জবাব দিতেই হবে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্যেই বলা হয়েছে পুরুষ নিজের ঘরের দায়িত্বশীল। এর পর বলেন ঃ

স্ত্রী স্বামীর ঘর এবং সন্তানদের যিম্মাদার

والمرأة راعية على بيت زوجها وولده

স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর এবং সন্তানদের যিম্মাদার। স্ত্রীদের উপর দু'টি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এক-স্বামীর ঘরের হেফাযত করা। অর্থাৎ স্বামীর ঘরের যাবতীয় বিষয় দেখা-শোনা করা এবং সুষ্ঠূ পরিবেশ বজায় রাখা। দুই-সন্তানদের দেখা-শোনা করা। সন্তানদের দেখা-শোনার ক্ষেত্রে সন্তানের পার্থিব এবং অপার্থিব কল্যাণ উভয়ই উদ্দেশ্য। এটা স্ত্রীর একান্ত পালনীয় দায়িত্ব। হাদীসে এ সকল দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

স্ত্রী জাতি হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করবে

হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) জান্নাতী রমনীগণের সর্দার। বিয়ের পর স্বামী হযরত আলী (রাযিঃ)-এর গৃহে তাশরিফ নিয়ে গেলে হযরত ফাতেমা এবং হযরত আলী (রাযিঃ) দু'জনে মিলে পরস্পর এই সিদ্ধান্ত করে নেন যে, আলী (রাযিঃ) বাইরের কাজ আঞ্জাম দিবেন আর ফাতেমা (রাযিঃ) ঘরের কাজ

সমাধা করবেন। সুতরাং হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) অত্যন্ত মেহনত করে ঘরের কাজ আঞ্জাম দিতেন এবং খুব আগ্রহের সাথেই তা করতেন। পাশাপাশি স্বামীর খেদমতও করতেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে পরিশ্রম অনেক বেশী হয়ে যেত। সে যুগটা তো আজকের যুগের মত ছিল না। আজকে তো বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে সুইস অন করলেই খানা প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু সে যুগে খানা প্রস্তুত করতে হলে চাক্কি দিয়ে আটা পেষতে হত, চুলায় আগুন দেওয়ার জন্য কাঠ কেটে আনতে হত, তারপর রুটি তৈরী হত। এক দীর্ঘ কার্যক্রম। যার ফলে হযরত ফাতেমার (রাযিঃ) খুবই কষ্ট হয়ে যেত। তা সত্ত্বেও হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা করে যেতেন। কিন্তু খায়বর যুদ্ধের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গনীমতের অনেক সম্পদ এল। সে সকল সম্পদে গোলাম এবং বাঁদীও ছিল। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের মাঝে তা বন্টন করতে শুরু করলেন।

এরই মধ্যে কেউ হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে বলল, আপনিও যান এবং আপনার পিতা রাসূলের নিকট থেকে একটি বাঁদী চেয়ে নিন। সুতরাং হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) মা আয়েশা (রাযিঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, চাক্কি ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে দাগ পড়ে গেছে এবং পানির মশক উঠাতে উঠাতে আমার কোমর নীল হয়ে গেছে।

যেহেতু গনীমতের মালে অনেক গোলাম বাঁদী এসেছে, সুতরাং যদি একটি গোলাম বা বাঁদী মিলে যায়, তাহলে আমি এই কষ্ট থেকে একটু রেহাই পেতে পারি। এ টুকু বলে হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) স্বীয় গৃহে ফিরে এলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ঘরে এলে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মেয়ে ফাতেমা (রাযিঃ) এসেছিলেন। তিনি এই বলে গেছেন। যত কিছুই হোক পিতার সামনে নিজের প্রাণপ্রিয় মেয়ের এই দূরবস্থা বর্ণনা করা হলে পিতার মনে কষ্ট লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, মা ফাতেমা! তুমি আমার নিকট একটি গোলাম বা বাঁদী প্রার্থনা করেছ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনার সকল মানুষ একটি করে গোলাম বা বাঁদী না পাবে, সে পর্যন্ত মুহাম্মদের বেটীকে একটি গোলাম বা বাঁদী প্রদান করাকে আমি মেনে নিতে পারব না।

স্ত্রীদের জন্য এক দুর্লভ ব্যবস্থাপত্র 'তাসবীহে ফাতেমী'

অবশ্য আমি তোমাকে একটি ব্যবস্থাপত্র বাতলে দিচ্ছি, যা তোমার জন্য গোলাম এবং বাঁদী থেকে উত্তম হবে। তা এই যে, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। এটা তোমার জন্য গোলাম-বাঁদী অপেক্ষা অনেক উপকারী প্রমাণিত হবে। মেয়ে ছিলেন স্বয়ং রাসূলের মেয়ে, সুতরাং এর পর তিনি আর কোন কথা বলেননি বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু বললেন, তাতেই শান্ত হয়ে ফিরে এলেন। এ জন্যেই এই তাসবীহকে তাসবীহে ফাতেমী বলা হয়। (জামেউল উসূল ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মেয়েকে উম্মতের নারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিয়ে গেছেন যে, স্ত্রী হলে এরূপ হওয়া উচিত। নীতি–নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ্ থেকে অধিকার যাই হোক, রাসূলের সুন্নত এটাই যে, স্ত্রী নিজ স্বামীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ফলে সে স্বামীর গৃহ হেফাযতের গুরু দায়িত্ব নিজের কাজ মনে করে আঞ্জাম দিবে।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা মায়ের দায়িত্ব

স্বামীর গৃহের হেফাযত পর্যন্তই স্ত্রীর দায়িত্ব শেষ নয়, বরং সন্তানদের লালন-পালন, তাদের দেখা-শোনা, শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী জাতির উপর অর্পণ করেছেন। যদি সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ঠিকভাবে না হয়, তাঁর মাঝে ইসলামী আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার না আসে, তাহলে এ জন্যে প্রথমে মাকে প্রশ্ন করা হবে। তারপর পিতাকে জবাবদিহী করতে হবে। কারণ এ সকল বিষয়ের প্রথম দায়িত্বশীল মা।

কাজেই প্রথম মাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার কোলে প্রতিপালিত হয়ে সন্তান কেন দ্বীন-ঈমানের অধিকারী হল না? তার মন-মানসে ইসলামী তাহ্যীব-তমদ্দুন কেন ডুকল না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামীর গৃহ এবং সন্তানদের তা'লীম-তরবিয়তের ব্যাপারে স্ত্রী জাতিকে জিজ্ঞেস করা হবে। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার সেই বাক্যটাই উল্লেখ করেছেন ঃ

وكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته

অর্থাৎ প্রত্যেকেই তোমরা রাখাল বা শাসক এবং প্রত্যেকেই নিজের অধিনস্ত বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমতে আমাদের সকলকে এ সকল দায়িত্ব বুঝে তার উপর আমল করার তওফীক প্রদান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

ডিজাইন ঃ নাজমুল

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার।
ঢাকা। ফোন ঃ ৭৩১০১৫৩

পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা